সাহিত্য আর্কাইভের উপন্যাস সিরিজের পঞ্চম নিবেদন

আদিম অন্ধকারে অর্জুন

সমরেশ মজুমদার

সাহিত্য আর্কাইভ

সাহিত্য আর্কাইভের অন্যান্য প্রচেষ্টা

ছোটগল্প

ছোটদের বারো গপ্পো – প্রথম খণ্ড

কাহিনী দ্বাদশ – প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড

ছুটির দিনের গপ্পো – প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড

ইন্দ্রনীল সান্যাল – ব্যাচেলার্স পার্টি

উপন্যাসিকা

ব্রাত্য বসু – কালকের সাজাহান

উপন্যাস সিরিজ

১। জীবনানন্দ দাশ – মাল্যবান

২। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – ঈগলের চোখ

৩। প্রবীর হালদার – মহীরুহ

৪। জয় গোস্বামী - টাকা

রচনাবলী সিরিজ

১। সমরেশ বসু – কালকূট রচনা সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড)

২০১৪

কুলদীপ সিং-এর সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় হয়েছিল একটু অদ্ভুতভাবে। গয়েরকাটা হয়ে নাথুয়াতে যাচ্ছিল সে তার বাইকে চেপে। নাথুয়া থেকে চিঠি লিখেছিলেন দিবাকরবাবু। জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ার সময় যে সব শিক্ষক খুব ছাত্রপ্রিয় ছিলেন দিবাকরবাবু তাঁদের একজন। বিয়ে-থা করেননি। স্কুলের পাশেই একটা ঘর ভাড়া করে একাই থাকতেন। অর্জুন ওঁকে কখনও গম্ভীর মুখে দেখেনি। অবসর নেওয়ার পর তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন তার খবর জানা ছিল না। তার অনেক আগেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এসেছিল সে। এই দিবাকরবাবুর চিঠি এসেছিল তার নামে, স্কুলের ঠিকানায়। স্কুলের দারোয়ান সেটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। চিঠিতে দিবাকরবাবু লিখেছেন, "এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কি না জানি না। তোমার কথা বিভিন্ন পত্রিকায় পড়ি। সবাইকে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকুরে হতেই হবে, তার কী মানে আছে? তুমি তো তার থেকে বহু যোজন দূরের পেশা বেছে নিয়েছ। তাই মনে হল, তোমাকে দরকার। ধরে নাও, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি যদি তা থেকে অমূল্যরতন পেতে পারো তাহলে তার কৃতিত্ব তোমার। গয়েরকাটা হয়ে খুঁটিমারির জঙ্গল পেরিয়ে নাথুয়াতে এসে নাম বললেই যে-কেউ আমার আস্তানা দেখিয়ে দেবে। আমি বিখ্যাত ডায়না নদীর পাশেই থাকি। আশীর্বাদ নিও।"

ফর্সা, বেশ রোগা, লম্বা চেহারার মানুষটির চিঠি পড়ে অর্জুন বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পরের সকালে। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা ব্রিজ হয়ে গয়েরকাটায় পৌঁছতে লেগেছিল একঘণ্টা। চৌমাথার চায়ের দোকানে ওমলেট আর চা খেতে খেতে কানে এল একটা বিশাল হাতির দল আশ্রয় নিয়েছে ওই খুঁটিমারার জঙ্গলে। মাঝে মাঝেই, রাত বাড়লেই তারা ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। বনবিভাগের লোকজন পটকা ফাটিয়ে তাদের ভয় পাইয়ে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলেও মানুষ মশাল জ্বালিয়ে টিনে শব্দ তুলে রাত জাগছে।

চায়ের দাম দেওয়ার সময় অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "নাথুয়ার রাস্তা দিয়ে সবাই যাতায়াত করছে?"

"কমে গেছে। দিনের আলো ফুরোবার আগেই বাস বন্ধ হয়ে যায়। শুনেছি কয়েকটা হাতি না কি ঘাপটি মেরে রাস্তার পাশের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে যাবেন না কি?" দোকানদার জিজ্ঞাসা করল।

"যাই, হাতি দেখে আসি।" অর্জুন বাইকের দিকে এগোল।

চায়ের দোকানের মন্তব্য ভেসে এল, "হাতি দেখবে! রক্ত গরম তো, ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দ্যাখেনি।"

"কথাটার মানে কী দাঁড়াল বলরাম দা?" কেউ প্রশ্নটা করল।

অর্জুন বেরিয়ে এল বাইকে চেপে। লোকে ফাঁদ পেতে ঘুঘু ধরে। তাহলে কথাটা বলা হয় কেন? যে ঘুঘু দেখবে তাকে ফাঁদ দেখতে হবে কেন? ধরা যাক, অন্য কেউ ফাঁদ পেতেছিল ঘুঘুর জন্য, সেই ফাঁদে পড়লে মানুষের তো আটকে পড়া অসম্ভব।

বাঁ-দিকে গয়েরকাটার স্কুল, কিছু ঘরবাড়ি। তারপর লোকালয় শেষ। দু'পাশে চায়ের বাগান। সেটা শেষ হলে ডানদিকে একটা বড় পার্ক এবং রিসর্ট। কিন্তু সেখানে কোনও মানুষ দেখতে পেল না অর্জুন। তারপর মেছুয়াগুল পেরিয়ে খুঁটিমারির জঙ্গলে ঢুকল সে। সরু পিচের রাস্তা জঙ্গল চিরে চলে গিয়েছে নাথুয়ার দিকে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা। মাঝে মাঝে পাখির ডাক। রাস্তাটা পরিষ্কার। মানুষ দূরের কথা, কোনও গাড়ি বা বাইকও নেই।

রাস্তাটা সামান্য বাঁক নিতেই বাইক থামাল অর্জুন। দুই-আড়াইশো গজ দূরে দুটো হাতি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার শুঁড় দিয়ে যা তুলতে চাইছে সেটা যে একটা চারচাকার লরি তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। লরিটা উল্টে রয়েছে। ছোট হাতি শুঁড় দিয়ে চাকা ঘোরাবার মজা পাচ্ছে। যেতে হলে ওদের পাশ দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হাতি দু'টো ওখান থেকে সরে না গেলে মৃত্যু অবধারিত।

তবে দুটো হাতি দলছাড়া হয়ে বেশিক্ষণ থাকবে না। নিশ্চয়ই দল কাছাকাছি রয়েছে। এখান থেকে গয়েরকাটায় ফিরে গিয়ে কোনও লাভ নেই। তার মনে হল হাতি দুটো যদি তাকে ধরতে দৌড়ে আসে তাহলে বাইকের গতির সঙ্গে পারবে না। অন্তত ষাট-সত্তর গজের ব্যবধান থাকলে কিছুতেই নয়। সে বাইক নিয়ে এগিয়ে গেল আরও দেড়শো গজ। এখন হাতিদুটো তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভঙ্গিতে সতর্কতা। আচমকা ওরা এগোতে থাকল অর্জুনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই প্রচণ্ড জোরে ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়াল। সেই সঙ্গে বাইকের তীব্র হর্ন।

হাতিদুটো দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ছোট হাতিটা দুদ্দাড় করে বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। বড় হাতিটা ওর যাওয়াটা দেখল কিন্তু নড়ল না। অর্জুন আরও একটু সাহসী হয়ে দশগজ এগোল। হাতি তেড়ে এলেই সে বাইক ঘুরিয়ে গয়েরকাটার দিকে ছুটবে। হাতিটা মাথার উপর শুঁড় তুলতেই আবার ইঞ্জিনের শব্দ বাড়াল। অর্জুন দেখল হাতিটা শুঁড় নামিয়ে খুব শান্তভঙ্গিতে ছোট হাতি যেদিকে গিয়েছিল, সেদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এখন রাস্তা শুনশান। সোজা যাওয়ার সময় ওই হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। অর্জুন ধীরে ধীরে ধীরে এগোল বাইকে চেপে। লরির কাছে আসতেই সে শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা আসছে লরির পেটের ভিতর থেকে। উল্টে থাকা লরির ভিতরে থেকে কেউ আওয়াজ করছে। নিশ্চয়ই কেউ আটকে রয়েছে ওখানে। কিন্তু এখানে বাইক থেকে নামা বিপজ্জনক। তবু চলে যেতে পারল না। সে বাইক থামিয়ে চারপাশে তাকাল। না, কোথাও জঙ্গলের গাছ নড়ছে না। সে বাইক থেকে নেমে দ্রুত লরিটার পাশে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ভিতরে কেউ আছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব ভেসে এল, "হাঁ হাঁ, হাম হ্যায়।"

মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় একটা বিশাল চেহারার সর্দারজিকে লরির ভিতর থেকে টেনে বের করল অর্জুন। লোকটার সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে। বাইরে বেরিয়ে হাউ হাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল সর্দারজি। "আপনি আমাকে জীবন দিলেন বাবুজি, ওরা আমাকে ঠিক মেরে ফেলত।"

অর্জুন দ্রুত চারপাশে তাকাল। লরির নিচে একটা নালা থাকায় লোকটা বেঁচে গেল। সে দ্রুত বাইকে উঠে বলল, "আপনি পিছনে বসতে পারবেন?"

লেংচে লেংচে সর্দারজি কোনওরকমে ব্যাক সিটে উঠে বসল। লোকটার মাথার পাশ থেকে রক্ত ঝরছে। অর্জুন বলল, "সাবধানে বসুন।" তারপর বাইক চালু করে স্পিড বাড়াল। কিন্তু মাইল খানেক গিয়ে আবার গতি কমিয়ে দাঁড়াতে হল অর্জুনকে। বিশাল চেহারার চারটে বাইসন ডান দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়াল। পিছনে বসা সর্দারজি কাতর গলায় বলল, "মর গিয়া, হাতির থেকে ডেঞ্জারাস এরা।"

"চুপ করুন।" ধমকাল অর্জুন।

"ঠিক হ্যায়।"

বাইসনগুলো চলে গেলে আবার বাইক চালাল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাজার এলাকায় পৌঁছে গেল ওরা। দু'পাশের গ্রামে প্রচুর মানুষ থাকেন বলে বোঝা যাচ্ছে। একটা ওষুধের দোকান চোখে পড়তেই অর্জুন বলল, "নেমে যান। ওখানে নিশ্চয় ডাক্তার আছেন। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করানো দরকার।"

"আপ ভি চলিয়ে বাবু।"

বাইক দাঁড় করিয়ে অর্জুন বলল, "আমি ডাক্তার নই যে আপনার কোনও উপকারে লাগব। তাছাড়া আমাকে এখনই নাথুয়াতে যেতে হবে।"

"আপনি নাথুয়ামে থাকেন?" সর্দারজি বাইক থেকে নামল।

"না।" ওখানে আমার স্কুলের মাস্টারমশাই আছেন! আমি

জলপাইগুড়িতে থাকি। যান।" অর্জুন বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এই লোকটা খুবই ভাগ্যবান। ড্রাইভারের কেবিনে ও একাই ছিল। কী করে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তা জিজ্ঞাসা করার সময় পাওয়া যায়নি। লোকটার অবস্থা কথা বলার মতো ছিল না। তবে লরিতে অন্য কোনও লোক থাকলে সর্দারজি অবশ্যই তার কথা বলত।

দিবাকরবাবুকে খুঁজতেই হল না। নাথুয়াতে পৌঁছে ওঁর নাম বলতেই কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এলেন, "মাস্টারমশাই-এর কাছে যাবেন? সোজা চলে যান। নদীর ধার দিয়ে কিছুটা গেলেই একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পাবেন। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, ওই বাড়ির পাশের বাগানে মাস্টারমশাই এখন ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। গেলেই দেখতে পাবেন।"

তাই দেখল অর্জুন। গোটা ছয়েক ছেলেমেয়েকে নোট দিচ্ছেন মাস্টারমশাই। এখন তাঁর চোখ বন্ধ, ছাত্রছাত্রীরা লিখে নিচ্ছে। ওঁর এই ভঙ্গি অর্জুনের খুব চেনা। ক্লাসে নোট দেওয়ার সময় মাস্টারমশাই-এর ভঙ্গি এইরকমই ছিল।

কিন্তু অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। পড়ানো হয়ে যাক, তারপর সে কাছে যাবে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মাস্টারমশাই আরও রোগা হয়ে গিয়েছেন। চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়েছে। মিনিট দশেক বাইকের উপর বসে থাকল অর্জুন। উল্টোদিকে নদীর বুকে এখন শুকনো নুড়ি-পাথর। দূরে একটি শীর্ণ জলের ধারা। এই চওড়া নদীর ওপাশে জঙ্গল এবং পাহাড়। অর্জুন অনুমান করল ওটা ভুটান। বর্ষার সময় নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে নদী। মাস্টারমশাই যে কাঠের বাড়িতে আছেন, সেটা কয়েকটা খুঁটির উপরে কিন্তু জল নিশ্চয়ই নদী ছেড়ে কাঠের সিঁড়ি পর্যন্ত উঠে যায়। তবে জায়গা খুব সুন্দর, চারধারে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। চাকরিজীবন জলপাইগুড়ি শহরে কাটিয়ে এই নির্জনে কেন চলে এলেন দিবাকর স্যর? আর এসে সেই ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে বাক্যটিকে সত্যি প্রমাণ করছেন?

একটু পরে পড়ানো শেষ হল। ছেলেমেয়েরা বাগান থেকে বেরিয়ে গঞ্জের দিকে যখন হাঁটতে লাগল তখন অর্জুন দেখল মাস্টারমশাই ফুলের গাছ থেকে শুকনো পাতা পরিষ্কার করছেন।

বাইক থেকে নেমে সোজা বাগানে ঢুকে প্রণাম করতেই মাস্টারমশাই ঘুরে দাঁড়ালেন, "কে? কে তুই?" তারপরেই তাঁর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল, "আরে! অর্জুন! তুমি কখন এলে! বাঃ, বেশ বড়সড় চেহারা হয়ে গেছে তোমার।"

"আপনি আমাকে অনেক বছর পর দেখলেন স্যর।"

"তা বটে।" বাইকটার দিকে তাকালেন তিনি, "ওকী! তুমি বাইকে চেপে এলে নাকি! সর্বনাশ। পথে কোনও বিপদ হয়নি তো?"

"বিপদ হবে কেন?" অর্জুন অবাক হওয়ার ভান করল।

"এই যে খুঁটিমারার জঙ্গল যা পার হয়ে তুমি এলে, বাস ছাড়া লোকে যাতায়াত করে না। তাও দিনে দিনে। বুনো হাতিতে ভরে গেছে। ওদের মধ্যে কিছু হাতি ভয়ঙ্কর বদমায়েশি করছে। কয়েকজনকে মেরেও ফেলেছে তারা। ইস্। তোমাকে আমার সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। চিঠি পেয়ে তুমি কিছু লিখলে নিশ্চয়ই খবরটা দিতাম। এই বাইকে আসবে আর আসতে সময় নেবে না তা ভাবিনি। চলো, ভেতরে চলো।" অর্জুনের কাঁধে হাত রেখে কাঠের সিঁড়ির দিকে এগোলেন মাস্টারমশাই। এই স্পর্শ বেশ ভাল লাগল অর্জুনের।

দোতলায় দু'টি ঘর। চিলতে বারান্দা। সেখানে দু'টি চেয়ার পাতা আছে। তার একটায় বসলেন মাস্টারমশাই, অন্যটিতে অর্জুনকে বসতে ইশারা করলেন।

এখন উপর থেকে বিশাল জলশূন্য নদীটাকে দেখে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "বর্ষার সময় জলে ভরে যায় না?"

"সেটাই তো স্বাভাবিক।" মাস্টারমশাই বললেন।

"জায়গাটা খুব সুন্দর।"

"তাই তো এখানে আছি। অনেক কাল শহরে থেকে মন বলল, চল, বাকি জীবনটা প্রকৃতির মধ্যে থাকি, চলে এলাম এখানে। চুপচাপ না বসে থেকে ছেলেমেয়েগুলো আসে, ওদের পড়াতেও ভাল লাগে। আজ ছুটির দিন বলে ওদের এই সময় দেখতে পেলে, নইলে ওরা আসে ভোর ছ'টায়। আটটায় ফিরে যায়।" হঠাৎ খেয়াল হল মাস্টারমশাই-এর, "আমি শুধু কথাই বলেছি, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো। আমি আজকাল নিরামিষ খাই, তোমার অসুবিধা হবে না তো?"

"স্যর। এখন পৃথিবীর ষাট ভাগ মানুষ নিরামিষ খায়। যে সব প্রাণী মাংস খায় তাদের সংখ্যা খুব কমে গেছে, অনেকেই বিলুপ্ত।" অর্জুন বলল। "কিন্তু আমার খাওয়া নিয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

"মোটেই ব্যস্ত হচ্ছি না। আমার একটি রাইস কুকার আছে। তাতে চাল আলু আর কাপড়ে ডাল বেঁধে জল দিয়ে বসিয়ে দিলে মিনিট কুড়ির মধ্যে চমৎকার খাবার তৈরি হয়ে যায়। খাওয়ার সময় একটু ঘি অথবা মাখন মাখলে তো কথাই নেই। রাইস কুকারে দু'জনের রান্না দিব্যি হয়ে যায়। বসো তুমি।" মাস্টারমশাই ভিতরে যেতে যেতে আবার দাঁড়ালেন। তুমি এই মেনুতে কী ধরনের ভাত পছন্দ করো? ঝরঝরে না একটু নরম?"

হেসে ফেলল অর্জুন, "আপনার যা পছন্দ—।"

মিনিট দশেক পরে ফিরে এলেন মাস্টারমশাই, "তুমি স্নান করবে?"

"না স্যর। করে এসেছি।"

"খুব ভাল লাগছে। অনেকদিন বাদে দোকলা খাব।"

"আপনি তো স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছেন।"

"ঠিক। তবে মাঝে মাঝে অন্যরকম হলে ভাল লাগে, এটাও তো ঠিক।"

"এখানে বন্যজন্তুরা আসে না?"

"মাঝে মাঝে আসে। ওই উল্টোদিকের ভুটানের পাহাড় জঙ্গল থেকে নেমে ওদিকের নদীর জল খায়। জ্যোৎস্নারাত্রে ওদের এতদূর থেকে দেখেও চিনতে অসুবিধা হয় না। আচ্ছা অর্জুন, তুমি তো কৌতূহল দেখাচ্ছ না?"

"কী ব্যাপারে স্যর?"

"আমি লিখেছিলাম, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি তার মধ্যে থেকে যদি অমূল্যরতন খুঁজে বের করতে পারো তাহলে তার কৃতিত্ব তোমার। তা তুমি ও ব্যাপারে তো কথা বলছ না!"

"স্যর, অমূল্যরতন কী তা তো জানি না, তবে চিঠি পড়ে আপনাকে দেখার আগ্রহ হয়েছিল বলেই চলে এসেছি।" অর্জুন বলল।

মাস্টারমশাই মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, "নদীর ওপাশে যে জঙ্গলটা দেখতে পাচ্ছ, কেমন কালচে অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে আছে ওটা যদিও ভুটানের সম্পত্তি, ভারতের এলাকার বাইরে কিন্তু যেতে ভিসা লাগে না। ইদানীং ভুটানের পুলিশ ভারতীয়দের কাছ থেকে পরিচয়পত্র দেখতে চায়। কিন্তু সেটা তো অনেকেই দেখাতে পারে, তবু এদিকের মানুষকে ওদিকে যেতে সচরাচর দেখা যায় না।"

"কেন?"

"প্রথম কথা ওদিকের জঙ্গল খুব ঘন, অনেক জায়গায় সূর্যের আলো, মাটি দূরের কথা, গাছের মাঝামাঝি পৌঁছয় না বিশাল পাতার আড়াল থাকায়। তার উপর কাঁটালতার আধিক্য আছে। সবচেয়ে বড় কারণ ওখানে প্রচুর পরিমাণে বন্যজন্তু আনাগোনা করে। বর্ষাকালে তো যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, শীতকালেও চোরাশিকারিরা সাহসী হয় না। তারা ভারতীয় অভয়ারণ্যেই নিরাপদে অভিযান চালায়।" মাস্টারমশাই বললেন।

"সেকি? আজও সেটা সম্ভব?" অর্জুন অবাক হল।

"তুমি খবরের কাগজ পড়ো না নাকি? কয়েকদিন আগে

চাপড়ামারির জঙ্গলে একটা হাতিকে মেরে তার দাঁত উপড়ে নিয়ে গিয়েছে বলে খবর ছাপা হয়েছিল। আমি এখানে আসার পর ভুটানের জঙ্গলে সেরকম ঘটনা ঘটেছে বলে কানে আসেনি।" মাস্টারমশাই বললেন।

অর্জুন বুঝতে পারছিল না মাস্টারমশাই তাকে ভুটানের জঙ্গল-পাহাড়ের কথা বলছেন কেন। তার তো ওখানে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। সে দেখল মাস্টারমশাই ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো, খেয়ে নেওয়া যাক। রাইস কুকারটা যে টাইমে চালু করা হয় তা শেষ হলে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ঠান্ডা হলে খেতে ভাল লাগবে না।"

সাদামাটা খাবার কিন্তু খেতে ভালই লাগল অর্জুনের। খাওয়া শেষ হলে হঠাৎ অনেকটা মেঘ চলে এল আকাশে। চারদিক ছায়া ছায়া হয়ে গেল। বসার ঘরে আরাম করে বসে মাস্টারমশাই বললেন, "বছর তিনেক আগের কথা। সময়টা নভেম্বরের শেষ। এই অঞ্চলের শীতটাকে ডেকে নিয়ে এল কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টি। নদীর জল আচমকা বেড়ে গেল। পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই নদীর চেহারা বদলে যায়। দু'পাশে জলের স্রোত বইলেও মাঝখানের চর সবে ডুবেছে। এই সময় গৃহবন্দি হয়ে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভাবলাম, চুটিয়ে বই পড়ব। কিন্তু তারও উপায় থাকল না, দ্বিতীয় দিনেই বিদ্যুৎ চলে গেল। ঝড়জল হলেই এই অঞ্চলে ওটা স্বাভাবিক ঘটনা। অতএব ভূতের মতো বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই।" বলে হাসলেন মাস্টারমশাই। "আচ্ছা অর্জুন, ভূত কি চুপচাপ বসে থাকে? নইলে কথাটা চালু হল কী করে? যাক গে, সারাদিন ঘন ছায়া, বৃষ্টি আর বিকেল না হতেই অন্ধকার। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি বলে ভরসা ছিল, জল এই বাড়ি পর্যন্ত উঠে আসবে না। ইলেকট্রিক নেই, রাইস কুকার অচল বলে ভাবলাম চিড়ে আর দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব। তখন রাত আটটা বাজে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। আকাশের অনেকটাই চিরে ফেলছে বিদ্যুৎ। তারপর এক মুহূর্তের জন্যে নদীটাকে স্পষ্ট করে আবার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। এই সময় আর্তনাদটা কানে এল। মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যাওয়া মানুষ আতঙ্কে ওই চিৎকার করতে পারে। টর্চ নিয়ে বারান্দায় এসে নিচে আলো ফেলতেই দেখলাম নদীর পাড়ে একটা শরীর মাটিতে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। মনে হচ্ছিল মানুষটার হাত নড়ছে।

এই মানুষ কোত্থেকে এল বুঝতে পারলাম না। টর্চের আলোয় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টির কারণে। কিন্তু ওইভাবে পড়ে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই যে মরে যাবে তাতে সন্দেহ ছিল না।

কী করব আমি? ভাবতেই শরীরে কী রকম শক্তি তৈরি হল। মানুষটা আমার বাড়ির সামনে পড়ে থেকে মরে যাবে আর আমি নিরাপদে শুয়ে থাকব, এটা হতে পারে না। টর্চ সিঁড়ির কাছে জ্বালিয়ে রেখে নিচে নেমে গেলাম। তারপর লোকটার কাছে পৌঁছবার আগে ভিজে চুপসে কাঁপতে লাগলাম ঠান্ডায়। লোকটা আমারই মতো রোগা, মুখে দাড়ির জঙ্গল, পরনে হাফ প্যান্ট আর ময়লাটে শার্ট, বাঁ কাঁধ থেকে একটা স্ট্র্যাপ ডান কোমরে নেমে এসেছে চামড়ার ব্যাগের মুখে। লোকটাকে ঝাঁকালাম, ডাকলাম কিন্তু কোনও হুঁশ নেই ওর। বিদ্যুৎ চমকালে পৃথিবী যখন সাদা তখন মনে হচ্ছিল লোকটা এইমাত্র মরে যাবে। শেষপর্যন্ত আমি ওকে কোনওমতে নিয়ে এলাম বাগানের ভিতর, ওকে সিঁড়ির কাছে রেখে কিছুক্ষণ হাঁফালাম। যথেষ্ট রোগা শরীর তবু ওকে উপরে তুলতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘরে একটা মাদুর পেতে ওকে শুইয়ে দিলাম। ভেজা জামা-প্যান্ট খুলে একটা কাপড় জড়িয়ে দিলাম শরীরে। হ্যারিকেনের আলোয় দেখলাম ওর হাত পা এবং কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। আমার ফার্স্ট এইড বক্স এনে সেগুলোকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলাম। নাথুয়াতে ডাক্তার আছেন। কিন্তু দুর্যোগের রাতে তাঁদের কাছে পৌঁছতেই পারব না। আমার কাছে কিছু হোমিওপ্যাথির ওষুধ ছিল। চোট পেয়ে রক্তপাত হয়েছে দেখে ওর মুখে আর্নিকার গুলি দিতেই সেটা জিভ দিয়ে টেনে নিল। কিছুক্ষণ উঃ, আঃ করে শেষপর্যন্ত চোখ বন্ধ করল। নাড়ি টিপে দেখলাম সেটা বন্ধ হয়নি।

রাতে আর খাইনি। মাঝে মাঝেই এই ঘরে এসে দেখে যাচ্ছিলাম। লোকটা একইভাবে পড়ে আছে। ভোর তিনটের সময় চোখ খুলল। পরিষ্কার গলায় বলল, "আমি এখন কোথায়?" কাউকে প্রশ্ন নয়, নিজের মনেই বলা।

"আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। একাই থাকি। আপনি আমার ঘরে। আপনার কোনও চিন্তা নেই। ঘুমিয়ে পড়ুন।" কথাগুলো শুনে চোখ বন্ধ করল সে।

সকাল আটটার পর ঘুম ভাঙলে উঠে বসার চেষ্টা করল। অত বেলাতেও সূর্য ওঠেনি। অন্তত আলো দেখা যায়নি। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নদীর মাঝখানে এখন প্রায় কোমর জল।

কপালে হাত দিয়ে বুঝলাম লোকটার বেশ জ্বর। এখন আর হোমিওপ্যাথি ওষুধে কাজ হবে বলে মনে হল না। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওই হাওয়া আর বৃষ্টিতে কিছুদূর গিয়ে বুঝলাম যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি ভিজে ডাক্তারের কাছে পৌঁছলেও তিনি ওই ভাবে আসবেন কেন? ফিরে এলাম। লোকটা বসেছিল একইভাবে। চা করলাম, সঙ্গে বিস্কুট। তারপর একটা ক্রোসিন ট্যাবলেট লোকটাকে খাইয়ে দিলাম চা-বিস্কুটের সঙ্গে। খেয়ে সে বাথরুম যেতে চাইল। অর্থাৎ এখন অনেকটা সচেতন হয়েছে। কিন্তু বাথরুম থেকে ফিরে আবার শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা।

বেলা বারোটা নাগাদ আমি যখন ভাবছি স্টোভেই ভাতে ভাত বসিয়ে দেব তখন লোকটার ঘুম ভাঙল। জিজ্ঞাসা করলাম, "জ্বর কেমন?"

সে মাথা নাড়ল। অবশ্য তার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

লোকটা উঠে বসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, "কী নাম আপনার?"

"স্টিফেন। স্টিফেন অ্যালফোর্ড। আমি বাঙালি।"

"এই বৃষ্টির মধ্যে এখানে কীভাবে এলেন?"

"প্রাণ বাঁচাতে নদী পার হয়ে এসেছি।" খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর লোকটার।

"আপনি ভুটানের জঙ্গল থেকে এসেছেন?" আমি অবাক।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল সে।

"আপনার বাড়ি কোথায়?"

"থিম্পুতে আমার জন্ম। আমার মা ভুটানি আর বাবা বাঙালি। দু'জনেই খ্রিস্টান। পনেরো বছর বয়সে ওরা একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। আমার এখন চল্লিশ বছর বয়স।

"কিন্তু থিম্পু তো এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে।"

"আমি এই এলাকায় গত দশ বছর আছি। ওই নদী থেকে দু'দিনের পথ গেলে একটা গ্রাম আছে। গ্রামটার নাম টুংচি। ওখানেই থাকতাম। আঃ। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ি।" স্টিফেন অ্যালফোর্ড আবার শুয়ে পড়ল।

বিকেলের আগেই বৃষ্টি ধরতেই আমি নাথুয়ার সবচেয়ে ভাল ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম। স্টিফেন অ্যালফোর্ড তখনও ঘুমোচ্ছে। তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, "আমি ভাল বোধ করছি না। ওকে এখনই জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে যান। মনে হচ্ছে ওর একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া এই যে ক্ষত হয়েছে, তা কোনও জন্তুর দাঁতের আঘাতেই হওয়া সম্ভব। কোথায় পেলেন ওকে?"

পুরো ঘটনাটা বললাম ওঁকে।

ডাক্তার বললেন, "ভুটানের নাগরিক হলে আর একটা সমস্যা হবে। থানায় জানানো দরকার। ও বিদেশি। কিন্তু এইরকম আবহাওয়ায় আর এখন যাওয়ার দরকার নেই। এই সময় জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার গাড়িও পাবেন না। কাল সকালে প্রথমে থানায় যাবেন। ওরা সামচিতে ভুটান সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে।"

"সামচি কোথায়?"

"বেশি দূরে নয়। গয়েরকাটা থেকে বানারহাট হয়ে যেতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে। ওটাই ভুটানের সবচেয়ে কাছের শহর। আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি। আর দুটো ট্যাবলেট, একটা এখন খাওয়াবেন, অন্যটা রাতে। ডাক্তার তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেলেন।

রাতে স্টিফেন আর একবার বাথরুমে গেল। দেখলাম পায়ে জোর এসেছে। ফিরে এসে আবার বসে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি রুটি বানাতে পারি না বলে ভাত খাই। খাবেন?" মুখে যতই দাড়ির জঙ্গল থাক, স্টিফেন হাসল, "হয়তো আমার জন্য ঈশ্বর একটু করুণা রেখেছিলেন, তাই আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি। দেখুন, আমি খুবই অসুস্থ। জানি না ক'দিন বাঁচব।"

"আপনাকে কালই ভুটান সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানকার পুলিশকে বললেই তারা সাহায্য করবে। ওরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে আপনি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।"

স্টিফেন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল, "আপনি দেখছি আমাকে মেরে ফেলতে চান। ভুটান গভর্নমেন্টের কয়েকজন পুলিশ অফিসার আমাকে বছর খানেক ধরে খুঁজছে। যার কাছেই পাঠানো হোক, ওরা খবর পেয়ে যাবে।"

"কেন খুঁজছে? আপনার অপরাধ কী?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"একটা ম্যাপের জন্যে। যেটা পেলে ওরা—।" থেমে গেল স্টিফেন। তারপর বলল, "আমি শুয়ে পড়ি।"

সকালে থানায় গেলাম। পুলিশকে সব বললাম। সঙ্গে ডাক্তারবাবুও ছিলেন। লোকাল পুলিশ জলপাইগুড়ির এসপি-কে খবর পাঠাল।

ফিরে এসে দেখলাম স্টিফেনের শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ হয়েছে। কিছুই খেতে চাইছে না। দুপুরবেলায় বলল, তার ব্যাগটা যেন আমি যত্ন করে রেখে দিই। কখনওই হাতছাড়া না করি। আমি ব্যাগটাকে রেখে দিলাম।

তিনটে নাগাদ ভুটানের গাড়ি এল। স্টিফেন তখন বেশ কাহিল। বললাম, 'তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে লোক এসেছে।'

তার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'তাহলে বেঁচে যেতে পারি। যদি বেঁচে ফিরে আসি তাহলে ব্যাগটা ফেরত নেব।'

নিয়ে যাওয়ার আগে স্টিফেন কীভাবে আমার কাছে এল তা ভুটানিরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। ব্যাগটা আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম। ভুটানি অফিসার জিজ্ঞাসা করেনি স্টিফেনের সঙ্গে জিনিসপত্র আছে কি না তাই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

সাতদিন পরে লোকাল থানা থেকে ওসি এলেন। খবর এসেছে স্টিফেন মারা গিয়েছে। দ্বিতীয়বারের আঘাত ওর হার্ট সহ্য করতে পারেনি। ভুটান পুলিশ জানতে চেয়েছে স্টিফেনের সঙ্গে কোনও মালপত্র ছিল কি না, থাকলে ওরা সেটা ফেরত চায়।

একবার মনে হল ব্যাগটা ফেরত দিয়ে দিই। তারপর স্টিফেনের ম্লান মুখ মনে পড়ে গেল। তার শেষ ইচ্ছে ছিল ওর ব্যাগটা যেন আমি কাউকে না দিই। জীবনে সবসময় চেষ্টা করেছি মিথ্যে না বলার। কিন্তু একজন মৃত মানুষের জন্যে অসত্য বললাম, না, সে কিছুই নিয়ে আসেনি। সঙ্গে থাকলে তা নদীর জলে ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক।

ক্রমশ স্টিফেনকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝেই নাকি দু-একজন ভুটানিকে এদিকে দেখা যাচ্ছিল। ভারতবর্ষে ভুটানিদের যাওয়া-আসার কোনও আইনি বাধা নেই। কিন্তু নাথুয়ার মতো জায়গায় কখনওই তাদের দেখা যায়নি। সে সময় আমি একটি পথের কুকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। দু'বেলা খাওয়ার বদলে যে বাড়িটাকে নিজের করে নিয়েছিল। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ বাড়িতে ঢুকতে পেত না। কিন্তু ছাত্রদের সে কিছু বলত না। কিন্তু একরাত্রে সে যেন পাগল হয়ে গেল। বুঝলাম কেউ আমার বাড়িতে ঢুকেছে। তারপর কুকুরটার আর্তচিৎকার শুনতে পেয়ে টর্চ নিয়ে দৌড়ে যেতে দেখলাম একটা লোক ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কুকুরটার গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে লোকটা। শরীরে প্রাণ নেই। ভোর হতেই থানায় গেলাম। মরার আগে লোকটার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল কুকুর। রক্ত পড়েছিল রাস্তায়। পুলিশ লোকটাকে ধরতে পেরেছিল। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারেনি। লোকটা হিন্দিও জানে না। ভুটান গভর্নমেন্টের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল।" মাস্টারমশাই থামলেন। অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বাড়িতে ভুটানি লোকটা কুকুর আছে জানা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে এসেছিল, তার মানে স্টিফেনের ব্যাগটা ওদের কাছে বেশ মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে।"

"এ ছাড়া চুরি করার মতো কিছু তো এই বাড়িতে নেই। কুকুরের কামড়ে লোকটা ভয়ঙ্কর আহত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কথা বলার অবস্থায় ছিল। তবু মুখ খোলেনি। তখন আমার কৌতূহল হল। আমি স্টিফেনের ব্যাগটা খুললাম। দুটো জামা, একটা প্যান্ট ছাড়া মাঝারি সাইজের চামড়ার চেন টানা ব্যাগ দেখতে পেলাম। সেটা খুলতেই একটা লাল রঙের ডায়েরি, কলম আর অতি বিবর্ণ ম্যাপ পেয়ে গেলাম। ডায়েরি ইংরেজিতে লেখা। হাতের লেখা ভাল। কিন্তু কোনও বাক্যেই ক্রিয়াপদ নেই। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ঘুরিয়ে কিছু বলতে চেয়েছে। যেমন, লং ওয়ে ইন সান'স ওয়ে। প্রথমে মানেই বুঝতে পারিনি। একদিন পরে মনে হল স্টিফেন লিখতে চেয়েছে সূর্যের পথে বহুদূরে যেতে হবে। তারপরেই খেয়াল হল, সূর্যের পথ তো পুব থেকে পশ্চিমে। অর্থাৎ স্টিফেন যেখানে ছিল সেখান থেকে অনেক দূরের পশ্চিমে যেতে হবে। কেন যাবে, গিয়ে কী পাওয়া যাবে তা ডায়েরিতে লেখা নেই। শেষ লাইনটা হল, ইফ আই নো মোর, প্রে ফর এ অনেস্ট ম্যান। আমি মরে গেলে একজন সৎ মানুষের জন্যে প্রার্থনা করছি। কেন? এই ডায়েরি আর ম্যাপটা সেই সৎ মানুষ নিয়ে কী করবে? আমি আর ঝুঁকি না নিয়ে চামড়ার ব্যাগ, বড় ব্যাগে ঢুকিয়ে এই বাড়ির এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম যে কারও পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে না।"

অর্জুন বলল, "মনে হচ্ছে স্টিফেন কোনও কিছুর সন্ধানে ছিল!"

"হ্যাঁ। তাই তো তোমাকে লিখেছি, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি যদি তা থেকে অমূল্যরতন খুঁজে বের করতে পারো তাহলে কৃতিত্ব তোমার। এতদিন ধরে তুমি অপরাধীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছ, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাও।"

মাস্টারমশাই অর্জুনকে নিয়ে বাগানে নেমে এলেন। ফুলগাছগুলোর শেষে একটা মাঝারি উচ্চতার কাঁঠালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। প্রচুর পাতা তার ডালে ডালে। মাস্টারমশাই বললেন, "গাছটার ওপরের দিকে একটা বড় গর্ত আছে।" ব্যাগটাকে প্লাস্টিকে মুড়ে ওই গর্তে রেখেছি। দ্যাখো তো, হাত যায় কি না!'

অর্জুন মুখ তুলে গর্তটাকে দেখল। ডালপাতার আড়াল থাকায় গাছের একেবারে গায়ে না এলে গর্তটাকে চোখেই পড়বে না। বাগানের ভেতর থেকে দুটো ইট নিয়ে এসে কী মনে হতে পড়ে থাকা একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে ইটের ওপর উঠতেই গর্তের অনেকটা কাছাকাছি চলে এল। মাস্টারমশাই বললেন, "যখন রেখেছিলাম তখন গর্ত অনেক নিচে ছিল। গাছটা বেশ লম্বা হয়ে গেছে।"

অর্জুন সরু ডালটা গর্তের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করল যাতে খুঁচিয়ে ব্যাগটার অংশ বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয়বার খোঁচাতেই হিস হিস শব্দ কানে এল। তারপর গর্ত থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে একটা সাপ ফণা তুলে তার মুখ দোলাল। অর্জুন দ্রুত সরে এসেছিল পেছনে। মাস্টারমশাই বললেন, 'একী! ইনি কবে থেকে ওখানে আশ্রয় নিয়েছেন?'

কুচকুচে কালো সড়সড় করে নেমে পড়ল ফণা গুটিয়ে। তারপর দ্রুত চলে গেল বাগানের ভেতর দিয়ে সীমানার বাইরে।

"এই ব্যাটা কেউটে। আমার বাগানে কেউটে আছে তা আমিই জানতাম না। কিন্তু তুমি কি এরকম কিছু অনুমান করেছিলে বলে সরু ডালটা ঢুকিয়েছিলে?"

"না স্যর। হঠাৎ মনে হল হাত না ঢুকিয়ে কাঠি ঢুকিয়ে দেখি। কেন মনে হল তা জানি না।"

"একেই বলে নিজের অজান্তে বিপদ আশঙ্কা করে সতর্ক হওয়া। তুমি হাত ঢোকালে যে কী হত আমি ভাবতেই পারছি নাঃ। ওটা ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ। যাক, বাগানে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াতে হবে। তুমি আর হাত ঢুকিও না, ওটার জোড়া ভেতরে আছে কি না কে জানে।"

অর্জুন আবার সরু ডালটা ভেতরে ঢোকাল। খানিকক্ষণ খোঁচাখুঁচি করার পর বড় ব্যাগটার স্ট্র্যাপ বাইরে বেরিয়ে এল। সেটা ধরে টেনে নিচে নামিয়ে আনল অর্জুন।

মাস্টারমশাই বললেন, "ওটা খোলো, ভেতরে চামড়ার ব্যাগ দেখতে পাবে।"

দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি চামড়ার ব্যাগের চেন খুলে একটা ছোট লাল রঙের ডায়েরি এবং একটা খাম বের করল অর্জুন।

মাস্টারমশাই বললেন, "বড় ব্যাগটাকে গর্তেই ঢুকিয়ে রেখে ওটা নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে এসো।"

দোতলার বসার ঘরে বসে ডায়েরিতে চোখ রাখল অর্জুন। ঠিকই, কোনও বাক্যেই ক্রিয়াপদ নেই। বাক্যগুলো পড়লে মনে হয় অন্য কোনও অর্থ আছে। মাঝে মাঝে রোমানে অচেনা শব্দ লিখেছে স্টিফেন। সেটা কোন ভাষার শব্দ তা অর্জুন জানে না। খাম থেকে খুব পুরনো ভাঁজ করা কাগজ বের করে সন্তর্পণে খুলল সে। ভাঁজগুলো প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। অবশ্যই এটা ম্যাপ। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, আঁকা রয়েছে যা ভেদ করে রেখা চলে গেছে। রেখা শুরু হয়েছে যেখান থেকে সেখানে ইংরেজিতে ছোট্ট করে লেখা টুংচি। মাঝে মাঝে ভুটানি নাম রয়েছে যেগুলো অবশ্যই কোনও জায়গার নাম। অর্জুন কাগজ ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্যর। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এই ডায়েরি আর ম্যাপ নিয়ে গিয়ে রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমি ভুটানি জানি না তাই শেষপর্যন্ত..।" কথা শেষ না করে ঠোঁট কামড়াল অর্জুন।

মাস্টারমশাই মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। কিন্তু কোনও ভুটানিকে এসব দেখিও না। খবরটা চাপা নাও থাকতে পারে। তুমি নিয়ে যাও, চেষ্টা করো। যদি উদ্ধার করতে না পারো তাহলে ফিরিয়ে দিও।"

ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "তাহলে যাই স্যার।"

"এ্যাঁ। এইসময় যাবে কেন? বিকেল হল বলে। বিকেলের পরে ওই রাস্তায় কেউ যায় না। তুমি বিপদে পড়ে যাবে। রাতটা এখানেই থেকে যাও।" মাস্টারমশাই আপত্তি জানালেন।

"বাড়িতে বলেছি ফিরে আসব। তাড়াতাড়ি চালালে সন্ধের আগেই গয়েরকাটা পৌঁছে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না।" মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে অর্জুন বেরিয়ে এল। ব্যাগটাকে শার্টের তলায়, প্যান্টের ভেতর গুঁজে দিল সে।

গতি বাড়াচ্ছিল অর্জুন। নাথুয়া বাজার ছাড়িয়ে লোকালয় পেছনে ফেলে সে যখন এগোচ্ছে তখন ওপাশ থেকে গাড়ি, বাস বেশ দ্রুতগতিতে নাথুয়ায় চলে আসছে। আকাশের দিকে তাকাল অর্জুন। অবেলা থাকতে থাকতে খুঁটিমারির জঙ্গল পেরিয়ে যেতে অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন দু'পাশে চাষের জমি, আগাছার বন। জঙ্গল শুরু হবে খানিক বাদে। কিন্তু তার আগে অর্জুন পৌঁছে গেল সেই জনপদে যেখানে সে সর্দারজিকে নামিয়ে দিয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। সর্দারজি নিশ্চয়ই একটু সুস্থ হয়ে লোক জোগাড় করে তার লরি উদ্ধার করে ফিরে গেছে। আর একটু এগোতেই ছোটখাটো জটলা দেখতে পেল। একটা টেম্পোকে ঘিরে কথা বলছে কয়েকজন লোক এবং তাদের মধ্যে সর্দারজিকে দেখতে পেয়ে বাইক থামাল অর্জুন। লোকটা সেই তখন থেকে এখানেই থেকে গেছে।

অর্জুনকে দেখতে পেয়েই সর্দারজি ছুটে এল "মর গিয়া। বলছি ডাবল টাকা দেব কিন্তু ডরপুক যেতে রাজি হচ্ছে না।"

টেম্পোতে হেলান দিয়ে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সে বলল, "প্রাণটা তো আমার। টাকার জন্যে সেটা দিতে পারি না। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, ব্যস, আর ফিরে আসতে পারব না।"

সর্দারজি বলল, "কিয়া বলেগা বাবু। তখন থেকে দশজনকে রিকোয়েস্ট করেছি কেউ গাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে না। এই যে কুলিগুলো, এদের রাজি করিয়েছি আমার লরিটাকে রাস্তায় তুলে দেবে। পাঁচজন হাজার টাকা ডিম্যান্ড করল, তাই দেব, কিন্তু এরা তো হেঁটে ওখানে যেতে পারবে না। একদম মর গিয়া।"

অর্জুন বলল, "আপনার উচিত ছিল বাস ধরে নিজের জায়গায় চলে যাওয়া। সেখান থেকে লোকজন জোগাড় করে আর একটা লরিতে স্পটে এসে ওটাকে তোলা। আজ আর হবে না, বাস ধরে বাড়িতে চলে যান, রাত্রে আপনার লরিকে কেউ টাচ করবে না। কাল সকালে এসে নিয়ে যাবেন।"

কৌতূহলীদের একজন বলল, "লাস্ট বাস বেরিয়ে গেছে। যাবে কী করে?"

সর্দারজি চেঁচিয়ে উঠল, "আই বাপ! মর গিয়া। আমাকে বাঁচান বাবু। আপনার পেছনে উঠে বসি?"

অগত্যা মাথা নাড়ল অর্জুন।

ওজন বেড়ে যাওয়ায় বাইকের গতি কমে গেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনার শরীর কেমন আছে?"

"ডাক্তার বলছিল পা ভাঙতে পারত, ভাঙেনি, বহুৎ পেইন হচ্ছে।" সর্দারজি বলল, "কাল সকালে ঠিক হয়ে যাবে।"

ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। পিচের রাস্তায় এখন আলতো ছায়া। দু'পাশের গভীর জঙ্গল কালচে হয়ে আসছে। ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে কান ঝালাপালা করে দেওয়া পাখিদের চিৎকার আর বাঁদরদের ডাল ধরে বাঁদরামি সমানে চলছে। সর্দারজি তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বসে আছে। লোকটা কথা বলছে না। অর্জুন সতর্ক হয়ে বাইক চালাচ্ছিল।

ক্রমশ অর্জুনের মনে হচ্ছিল, সর্দারজির জন্যে না দাঁড়ালে স্বচ্ছন্দে এই জায়গাটা পেরিয়ে যেতে পারত। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা বাঁক নিতেই অর্জুন তার বাইক থামিয়ে দিল। পেছন থেকে সর্দারজি জিজ্ঞাসা করল, "কিয়া হুয়া?"

"তাকিয়ে দেখুন।" অর্জুন বলল।

ব্যাক সিটে বসেই সর্দারজি মুখ বাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "মর গিয়া। মেরা লরি খাড়া হো গিয়া!"

"সোজা হয়নি, পাশ ফিরেছে।" বলতে বলতে চারপাশে তাকাল অর্জুন। একেবারে উল্টে থাকা লরির নিচ থেকে সর্দারজিকে টেনে বের করে এনেছিল সে। তখন ওর চাকাগুলো আকাশমুখী ছিল। এখন লরি কাৎ হয়ে আছে। কী করে সম্ভব?

অর্জুন বাইক চালু করল। একেবারে কাছে এসে সর্দারজি চেঁচাতে লাগল, "রোখিয়ে বাবু। থোড়াসে ধাক্কা দিজিয়ে, লরি খাড়া হো যায়েগা। বাবু, হামরা সাথ হাত মেলাইয়ে।"

কাছাকাছি কোনও জন্তু চোখে পড়ছে না। কিন্তু এখানে পাখির চিৎকার নেই, শুধু একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে। অর্জুন বাইক থামাল।

মিনিট তিনেক ধরে দু'জনের চেষ্টাতেও লরিটাকে সোজা করা গেল না। অর্জুন দেখল যেদিকে গেলে লরি সোজা হতে পারে সেদিকে একটা বড় কাঠের গুঁড়ি লরির নিচে ঢুকে আছে। ওটাকে কেটে না সরালে লরি সোজা করা যাবে না। সে বলল, "চলিয়ে।"

"মেরা লরি।" কাতর গলায় বলল সর্দারজি। তারপর চিৎকার করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে অবোধ্য ভাষায় নিজের রাগ প্রকাশ

করতে লাগল। বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না অর্জুন। হিন্দি বা পাঞ্জাবি যে নয় তা সে বুঝতে পারছিল। অর্জুন বাইকের কাছে ফিরে গিয়ে গলা তুলে ডাকল, "চলে আসুন।"

বিড়বিড় করতে করতে বাইকে উঠল সর্দারজি।

গয়েরকাটায় পৌঁছনোর পথে কোনও অসুবিধে হল না। এখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। চৌমাথার দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে। বাইক দাঁড় করিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"চামুর্চি।" সর্দারজি বলল, "এখান থেকে গাড়ি পেয়ে যাব।"

"আপনি ওখানে কতদিন আছেন?"

"বাবুজি, ওখানেই জন্মেছি আমি। আমি কুলদীপ, গ্যারাজ চালাই।"

"আমি জলপাইগুড়িতে থাকি। আমার নাম অর্জুন। আচ্ছা, আপনি তখন জঙ্গলে রেগে গিয়ে কী ভাষায় কথা বলছিলেন?"

"ও হো।" হেসে ফেলল কুলদীপ, "বাবুজি, চামুর্চি হল ভুটানের বর্ডার। ওপাশেই সামচি। ছেলেবেলা থেকেই আমরা নিজের ভাষার সঙ্গে হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি বলতে যেমন পারি, তেমনই ভুটানিও পড়তে, লিখতে পারি।" রাগ হলে, দুঃখ হলে আমার মুখ থেকে ভুটানি বেরিয়ে পড়ে।"

অর্জুন কুলদীপকে ভাল করে দেখল। চেহারা বিশাল হলেও মানুষটার মধ্যে এক ধরনের সারল্য রয়েছে তা কথা বললেই বোঝা যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার মোবাইল নাম্বার বলবেন?"

"নো বাবুজি, আমি মোবাইল রাখি না। মোবাইল থাকলেই বউ বারবার ফোন করে আমাকে পাগল করে দেবে। আপনি আমার ল্যান্ড লাইনের নাম্বার নিতে পারেন।" কুলদীপ নাম্বার দিল।

রাত্রে বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না অর্জুনের। জীবনে যা ঘটে তার সবকিছুর ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা যায় না। যাকে কাকতালীয় বলে মনে হয়, তা কি একেবারেই অস্বাভাবিক? নইলে তার তো গর্তে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগটাকে বের করার কথা, সে হাত ঢোকাল না কেন? ঢোকালে কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত ছিল। মাস্টারমশাই যে ডায়েরি আর ম্যাপ দিলেন তার অনেকটাই সে বুঝতে পারেনি ভাষার কারণে। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, ওটা ভুটানি ভাষা হলে কোনও ভুটানিকে না দেখানোই উচিত হবে। কিন্তু কয়েকঘণ্টার মধ্যে এই কুলদীপকে সে যে ভাষায় গালাগাল দিতে শুনল, তা ভুটানি জানতে পেরে মনে হয়েছিল এমনটা কী করে হয়? এটাও কি এক ধরনের কাকতালীয়?

ঘুম আসছিল না। আলো জ্বেলে ডায়েরিটা বের করল অর্জুন। ক্রিয়াপদ নেই কেন? বক্তব্যকে রহস্যময় করার চেষ্টা? একটু একটু করে দু'পাতা পড়ে যখন মনে হচ্ছিল কিছুটা বোঝা যাচ্ছে তখনই ভুটানি শব্দে ধাক্কা খেল সে।

তিনদিন ধরে চেষ্টা করেও না ডায়েরি না ম্যাপের অর্থ বোধগম্য হচ্ছিল না অর্জুনের। প্রচণ্ড অস্বস্তি, যেন দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছিল। এই সময় কুলদীপের কথা মনে পড়ল। একটুও দ্বিধা না করে লোকটার ল্যান্ডলাইনের নাম্বারে ফোন করল সে।

রিসিভার তুলে একজন বয়স্ক মানুষ বললেন, "হাঁ জি।"

"কুলদীপ আছে?"

"কৌন?"

"আমার নাম অর্জুন।"

"আরে বাপ। আপনি ফোন করেছেন। বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ আপনাকে। বাবুজি, আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন", আরে এ কুলদীপ, জলদি আও, জলদি।"

"তারপরেই কুলদীপের গলা কানে এল, "হাঁ বাবুজি, বলুন।"

"কুলদীপ, আপনার সাহায্য আমার দরকার।"

"এ কী বলছেন বাবুজি। একবার হুকুম করুন।"

"আমি আপনার কাছে যাচ্ছি। জলপাইগুড়ি থেকে চামুর্চি যেতে খুব বেশি হলে দেড়-পৌনে দুই ঘণ্টা লাগবে। গ্যারাজে থাকবেন।" অর্জুন বলল, "একটা কথা, আপনি তো পরিষ্কার বাংলা বলেন। তাহলে হিন্দি বলার দরকার কী? ওটা তো আপনার মাতৃভাষা নয়। তাই না?"

"পাঞ্জাবির মুখে হিন্দি শুনতে চায় সবাই। ঠিক আছে দাদা, আপনার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলব।" কুলদীপ বলল।

চামুর্চিতে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে বানারহাট পর্যন্ত অভ্যস্ত গতিতে বাইক চালিয়েছিল অর্জুন কিন্তু রিয়াবাড়ি চা-বাগানের মুখের পিচের রাস্তায় শ'য়ে শ'য়ে কর্মী বিক্ষোভ দেখাচ্ছে রাস্তা বন্ধ করে। বাস-ট্রাম দূরের কথা, সাইকেল আরোহীকেও ছাড় দিচ্ছে না তারা। অর্জুন খোঁজ নিয়ে জানল বিক্ষোভের কারণ হল হাতি। এতকাল হাতি এসে খেতের ধান বা বাগানের কলা খেয়ে যেত। তার জন্যে প্রচুর অভিযোগ বাগানের ম্যানেজারের কাছে করেছে মানুষ। বনবিভাগকেও বারংবার জানানো হয়েছিল কিন্তু হাতিদের জব্দ করেনি ওরা। গত রাতে হাতিরা কুলিলাইনে ঢুকে এক বৃদ্ধকে আছাড় মেরেছে, ঘর ভেঙেছে। ম্যানেজার বা বনবিভাগ যদি এর বিহিত না করে তাহলে তারা রাস্তা অবরোধ করে রাখবে।

অর্জুন দেখল পুলিশের লোকজন লোকগুলোকে খুব বোঝাবার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা বুঝতে চাইছে না। রাস্তার অবরোধ না সরলে চামুর্চিতে যাওয়া যাবে না। এই সময় একটা হইচই শুরু হল। একটু আগের চিৎকারের থেকে এই হইচই-এর চরিত্র আলাদা। অর্জুন দেখল অবরোধকারীরা পিলপিল করে চা-বাগানের রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে পুলিশদেরও রাস্তায় দেখা গেল না। মুখ ঘুরিয়ে অর্জুন কারণটা বুঝতে পারল। প্রায় ষাট-সত্তর গজ দূরে, রাস্তার উল্টোদিকের চা-বাগানে বিশাল চেহারার হাতি এসে দাঁড়িয়েছে। তার দাঁত বেশ বড়, দৃষ্টি এদিকে। কিন্তু সে একা নয়, তা দেখতে সময় লাগল না। পিচের রাস্তায় তখন অর্জুন ছাড়া কেউ নেই। আতঙ্কিত মানুষরা চিৎকার করে তাকে রাস্তা ছেড়ে চলে আসতে বলছে। অর্জুন দেখল বড় হাতিটা এবার এদিকে আসার জন্যে পা ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বাইক চালু করেই গতি বাড়াল। পুলিশ যা পারেনি, হাতি সেই সমস্যার সমাধান করে দিল।

কুলদীপকে চামুর্চির মানুষ ভালই চেনে। নাম বলতে মোড়ের মাথায় আড্ডামারা লোকগুলো হইহই করে ওর গ্যারাজ দেখিয়ে দিল। মাঝারি সাইজের গ্যারাজ হলেও ভিতরে বাইরে অনেকগুলো গাড়ির কাজ চলছে। অর্জুন লক্ষ করল, বেশিরভাগ গাড়ির নাম্বার প্লেটে ভুটানের নম্বর। বাইক থেকে নামামাত্র কুলদীপ বেরিয়ে এল হাসিমুখে, "আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমাদের। বলে চিৎকার করল, "বাবা! আসুন।"

গ্যারাজের ভেতর থেকে যে বৃদ্ধ পাঞ্জাবি বেরিয়ে এলেন মাথার উপর হাতজোড় করে, তিনি যে যৌবনে বেশ শক্তিশালী ছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কুলদীপের বাবা বললেন, "আপনি আমার ছেলের জান বাঁচিয়েছেন, আমরা আপনার কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকলাম।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে প্রণাম করতে চাইলে তিনি সেটা নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। অর্জুন বলল, "আপনি আমার বাবার মতো। কুলদীপকে আমি বাঁচাইনি। ওর ভাগ্য বাঁচিয়েছে। কিন্তু ওর লরি নিয়ে আসার ব্যবস্থা কি হয়েছে?"

কুলদীপের বাবা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ। সকাল হতেই একটা ট্রাকে লোক চলে গেছে নিয়ে আসার জন্যে। বসুন বাবু, কী খাবেন বলুন।"

অর্জুন বলল, "চাচা, এখন কিছু খাব না। কুলদীপের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা বলার আছে, সেটা আগে বলে নিই, তারপর—।"

কুলদীপ মাথা নাড়ল, "আপনি কি ঘরে বসবেন?"

"এখান থেকে সামচি কতদূরে?"

"বেশি টাইম লাগবে না।" বলেই সংশোধন করল, "বেশি সময় লাগবে না।"

"তাহলে চলুন, ওখানেই যাই। জায়গাটা দেখে আসা যাবে।" অর্জুন বলল।

অর্জুনের বাইকে বসল কুলদীপ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোটখাটো পাহাড় দেখতে পেল ওরা। একদিকে ভ্যালি, নদী। তারপর ভারত সীমান্ত শেষ, ভুটানের শুরু। তার চেকপোস্টে গিয়ে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে এল কুলদীপ। অর্জুন বুঝল চেকপোস্টের ভুটানি কর্মীরা কুলদীপকে চেনে। হেসে কথা বলল ওরা।

বাঁ দিকে সামচি বাজারকে রেখে পাহাড়ি শহরটাকে চক্কর দিল ওরা। কুলদীপ চিনিয়ে দিচ্ছিল কোনওটা ফ্রুট ফ্যাক্টরি, কোনওটা মদের কারখানা। অর্জুন লক্ষ করছিল ভুটানি মহিলারা তাঁদের পোশাক পরে রাস্তায় হাঁটছেন। একটা লোহার বেড়া দেওয়া কম্পাউন্ডের শেষে সুন্দর কয়েকটা বাড়ি, মিলিটারির পোশাক পরা বন্দুক হাতে পাহারাদারদের দেখিয়ে কুলদীপ বলল, "এটা হল ভুটান সরকারের অফিস। ভুটানের ভিতরে কোনও কাজ করতে হলে এখান থেকে অনুমতি নিতে হয়। একবার একটা কলকাতার সিনেমা পার্টি বাংলা সিনেমার শুটিং করতে অনুমতি চেয়েছিল। ওই বাড়ি থেকে তাদের বলেছিল প্রতিদিনের জন্যে তিন লক্ষ টাকা জমা দিলে ভুটানের মাটিতে শুটিং করতে দেবে। ওরা এখান থেকে ফিরে গিয়েছিল।"

সামচি বাজারের একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টে বসে মোমোর অর্ডার দিল কুলদীপ। তারপর বলল, "বলুন।"

অর্জুন খুব সংক্ষেপে মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে পাওয়া ডায়েরি এবং ম্যাপের কথা ওকে বলল। স্টিফেন অ্যালফোর্ডের বলা কথাগুলো সে কুলদীপকে শোনাল। তারপর সঙ্গের ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে বলল, "যেহেতু এই ডায়েরির অনেক কথাই ভুটানি শব্দে লেখা তাই আমি মানে বুঝতে পারছি না। মাস্টারমশাই বলেছেন এই ডায়েরি যেন কোনও ভুটানিকে না দেখাই। ডায়েরি যে খুব মূল্যবান তার প্রমাণ হল এটা চুরি করার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ বা কারা এটা পেলে খুব লাভবান হবে বলে আবার চেষ্টা করবে পাওয়ার জন্যে। আর যারা চাইছে তারা ভুটানের মানুষ বলেই মাস্টারমশাই-এর ধারণা। আপনি বলেছিলেন ভুটানি ভাষা জানেন। ভুটানি গাড়ি আপনার গ্যারাজে সারানো হয়। চেকপোস্টেও দেখলাম এখানে আপনি অপরিচিত নন। আপনি আমাকে এই ডায়েরির ভাষা উদ্ধার করতে কি সাহায্য করবেন?"

কুলদীপ বলল, "এ আপনি কী বলছেন দাদা। আপনাকে সাহায্য করা এখন আমার ধর্ম। কিন্তু এখানে নয়। মোমো খেয়ে কোনও নির্জন জায়গায় চলুন। দেখুন, রেস্টুরেন্টে কয়েকজন ভুটানি বসে আছে।"

মোমো এবং চা খেয়ে ওরা বাইকে চেপে নেমে এল নদীর খানিকটা উপরে। সেখানে বড় বড় পাথর আদিকাল থেকে রয়েছে। তার উপর বসলে পাহাড়ি নদীটাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাদের এখানে বসে থাকতে দেখলে যে কেউ ভাববে তারা প্রকৃতি উপভোগ করছে। কুলদীপ বলল, "দিন।"

অর্জুন ডায়েরি বের করে কুলদীপকে দিল। একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুলদীপ বলল, "আমি একটা করে লাইন পড়ে সেটা হিন্দিতে অনুবাদ করে বলব?"

"ঠিক আছে।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

কুলদীপ শুরু করল। একটা লাইন মনে মনে পড়ে তার অনুবাদ বলতে লাগল সামান্য সময়ের ব্যবধানে। "আমি স্টিফেন অ্যালফোর্ড। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমার দক্ষতার কারণে ভাল মাইনের চাকরি দিয়েছিল একটা রোড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। আমি জন্মেছিলাম থিম্পুতে। আমার মা ভুটানি, বাবা বাঙালি। পড়াশোনা করেছিলাম কানপুরে। পনেরো বছর আগে এই চাকরির জন্যে থিম্পু থেকে অনেক দূরে ভুটানের এই প্রান্তে চলে আসি। সে সময় এদিকে তেমন রাস্তা ছিল না। পাহাড়ি এলাকায় ছিল গভীর জঙ্গল। জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে বিকেলের মধ্যেই আমরা ক্যাম্পে ঢুকে যেতাম। সেখানে বন্দুকধারী পাহারা দিত দিনরাত। হাতি তাড়াবার পটকা ফাটানো হত মাঝে মাঝে। জঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে কাছের গ্রামের নাম টুংচি। সেখানে জনা ষাটেক মানুষ বাস করত সেসময়। আমরা থাকতাম তাঁবুতে। কুলিদের জন্য তিনটে তাঁবু, আমার জন্যে একটা। সমস্যা ছিল খাবার নিয়ে। সপ্তাহে একদিন রেশন আসত। চাল, ডাল, আলু ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না বলে কুলিরা পাখি শিকার করত। কোনওদিন খরগোশ পেলে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। হঠাৎ ক্যাম্পের সবাই বিশ্রী জ্বরে আক্রান্ত হল। ম্যালেরিয়া নয়, শরীরে মাঝারি উত্তাপ আর হাতে-পায়ে মারাত্মক ব্যথা। দু'দিন পরেই কুলিরা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেল। তখন মোবাইল ফোন ছিল না। কুলিদের মতো আমি ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারছি না আবার হেড অফিসে খবর দিতেও পারছি না। যদিও যিশুর কৃপায় আমি ওই অসুখে আক্রান্ত হইনি। ওই সময় হাতির দল ক্যাম্পে হানা দিল। তখন বিকেল। পাহারাদার নেই। তাই বন্দুক চালিয়ে হাতি তাড়ানো যাবে না। বাধ্য হয়ে আমি উল্টোদিকে পালালাম। জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে থেকে দেখলাম, হাতিরা টেন্টগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে স্টোরে যে চাল, ডাল, আলু ছিল তা খেয়ে ফেলল। আমি পালালাম। রাত নামছে দ্রুত। যেতে যেতে বুঝলাম শরীর খারাপ লাগছে। যখন টুংচি গ্রামের কাছে পৌঁছেছি তখন বুঝলাম আর হাঁটা সম্ভব নয়। জ্বর এবং ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। কুলিদের অসুখটা একটু দেরিতে আমাকে ধরল। আমি মাটিতে বসে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম একটা বাঁশের মাচায় শুয়ে আছি। ঘরের কোণে কাঠ জ্বলছে। তার আগুনে যেটুকু দেখা যায় তাতে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। ওরা ভুটানি। নিজেদের ভাষায় আমাকে নিয়ে কথা বলছিল। আমি শুনলাম, গ্রামের কয়েকজন লোক ওদের জানিয়ে গেছে আমাকে ওখানে রাখা যাবে না। রাখলে ওই জ্বরে গ্রামের সবাই মারা যাবে। কেন ওই বুড়োবুড়ি গ্রামের প্রান্ত থেকে আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে এল তার কৈফিয়ত চেয়েছিল লোকগুলো। বুড়ো বুড়িকে বলছিল, "একজন অসুস্থ লোককে জঙ্গলের ধারে খোলা আকাশের নিচে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়? ভোরবেলায় দেখা যেত হায়েনা নেকড়েরা খেয়ে গেছে।" এই অবধি শুনে আমি চোখ বন্ধ করলাম। ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে দেরি হল না।

যিশুর আশীর্বাদে আমার জ্বর চলে গেল, একটু সুস্থ হলাম তিনদিন পরে। দেখলাম, যে বুড়োবুড়ি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এই গ্রাম ভুটানের ভিতরে কিন্তু সরকারি সাহায্য এখানে পৌঁছয় না। ঘন জঙ্গল এবং উঁচু পাহাড় চারদিকে ঘিরে থাকায় শহরে যাওয়ার কোনও পথ নেই। কিন্তু এরা খুব ভাল শিকার করতে পারে। বিশেষ করে হাতির বাচ্চা ধরতে এরা খুব পটু। প্রতি বছর শীতের শেষে এদের একটি দল জঙ্গল ভেদ করে চলে যায় ভারতবর্ষে, হাতি ধরে দিতে। তিনমাস থেকে ওরা ওই কাজের বিনিময়ে ভাল টাকা পায়। অবশ্য সেটা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণও হারায়। বর্ষার আগে জামাকাপড় থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে গাধার পিঠে চাপিয়ে যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়। আসার আগে সামনের বছর কার কাজ করতে যাবে তার অর্ডার পেয়ে যায়। সম্ভবত, ভারতবর্ষে এদের মতো হাতি ধরায় পটু লোকজন নেই। থাকলেও বোধহয় তাদের অনেক বেশি পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এই গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ শাক-সবজি সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকে। বছরে একবার মকাই হয়। এছাড়া বন্যজন্তু শিকার করলে

তার মাংস জোটে। আমি কয়েকটা বনমুরগি ধরতে পেরে তাদের খাঁচায় বন্দি করলাম। সবাই মাংস খেতে চাইলে আপত্তি জানিয়ে বললাম, "পরের বছর খাওয়া হবে।" অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের মুরগিগুলো ডিম দিল। সেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে আমি একটা বড়সড় পোলট্রি তৈরি করে ফেললাম। যা ডিম রোজ পাওয়া যেত তার অর্ধেক গ্রামের লোকদের খেতে দিতাম। বাকিগুলো থেকে বাচ্চা বের করাতাম। এই গ্রামের মানুষদের মনে আমার সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা ক্রমশ কমে আসছিল।

প্রায়ই ভাবতাম ওই গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু একা ওই গভীর জঙ্গল ভেদ করে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমরা যে রাস্তা তৈরির কাজে এসেছিলাম সেটা আর চালু হয়নি। হলে মাইল পাঁচেক দূর থেকেও ডিনামাইট ফাটানোর শব্দ কানে আসত। আমি যে হারিয়ে গেছি, আমার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি জেনেও কোম্পানির লোকজন কোনও তল্লাশি করেনি বুঝে খুব খারাপ লাগত। একবার ভাবলাম যারা ভারতবর্ষে হাতি শিকার করতে যায় তাদের দলে ঢুকে পড়ি। ওদের মুখে অসম এবং ডুয়ার্সের কথা শুনেছি। সেখানে পৌঁছে গেলে আমি স্বচ্ছন্দে থিম্পুতে পৌঁছে যেতে পারব। আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে যা এখানে কোনও কাজেই লাগছে না। লোকগুলো এও জানাল, ডুয়ার্সে ভুটানি টাকায় লেনদেন হয়।

কিন্তু আমার যাওয়া হল না। যাওয়ার কারণ ওই বুড়োবুড়ি। একদিন, যখন কোনও মানুষ কাছাকাছি নেই, তখন বুড়ি বুড়োকে বারংবার অনুরোধ করছিল আমাকে সব কথা খুলে বলতে। বুড়ো প্রথমদিকে রাজি হচ্ছিল না। দূরে বসে এইসব শুনে আমি বুড়িকে বললাম, "ওর যখন আপত্তি আছে তখন কেন তুমি এত অনুরোধ করছ।"

ওরা চুপ করে গেল। তখনও কিন্তু আমি জানি না, কী বিষয়ে ওরা কথা বলছিল।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো আমাকে কাছে ডেকে বলল, "আমি আপত্তি করছি তোমার কথা ভেবে। তুমি তো ভগবান বুদ্ধের উপাসক নও। তোমার ধর্ম বিদেশের। বিধর্মীর প্রাণ কি ভগবান বুদ্ধের সাহায্য পাবে? আমি জানি না।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। আমি খ্রিস্টান বটে কিন্তু যিশু ছাড়া আমি ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর, রামচন্দ্র এবং আল্লাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। যতক্ষণ আমি কোনও পাপ না করছি ততক্ষণ ওঁরা সবাই আমাকে সাহায্য করবেন বলে বিশ্বাস করি।"

এই কথা শুনে বুড়ো খুশি হলেন। তখন তিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না, মাজা ভেঙে গেছে। বুড়ি বলল, "তুমি সব কথা ওকে খুলে বলো।"

বুড়ো আঙুল তুলে দূরের পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখাল, "ওই যে ওই শৃঙ্গের ঠিক নিচে একটি গুহা আছে। সেই গুহাতে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু লুকিয়ে রাখা আছে। যার একটা পেলেই রাজা হওয়া যাবে। আমার ঠাকুরদার বাবার কাছে একটা কাগজ ছিল। সেটা বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ওই কাগজে লেখা আছে কীভাবে ওই গুহায় পৌঁছনো যাবে। বাবার মুখে শুনেছি অনেকেই ওই গুহায় পৌঁছবার চেষ্টা করেও পারেনি। বেশির ভাগই মারা গিয়েছে, কারণ তাদের হাতে এই কাগজটা পড়েনি। আমার ঠাকুরদার বাবা যেতে চেষ্টা করে কিন্তু মাঝপথেই পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়।" বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস নিয়ে বলল, "আমাদের বয়স হয়েছে। এখন চোখ বন্ধ করলেই মৃত্যুকে দেখতে পাই। আমরা চলে গেলে লোকে এই কাগজটার কথা জানতেই পারবে না। ফলে কোনওদিন কেউ গুহার ভিতরে পৌঁছতে পারবে না। কাগজটা তোমাকে দিতে চাই। কিন্তু ওই গুহা পাহারা দেয় যে সব প্রেতাত্মারা তারা কোনও বিধর্মীকে ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তোমার কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছে, তুমি মানুষ হিসাবে খুব ভাল। দ্যাখো চেষ্টা করে। কিন্তু আর একটা কথা। এরকম একটা কাগজ যে আছে, তা কেউ কেউ জানে। একসময় নাকি কাগজ খোঁজার জন্য খুব মরিয়া হয়েছিল তারা। শুনেছি তারা দূর শহরের ক্ষমতাবান মানুষ। তাই এই কাগজটার কথা অত্যন্ত গোপন রাখবে। এই গ্রামের কোনও কোনও বুড়ো খবরটা শুনেছে। কিন্তু তারা জানে না কাগজটা আমার ঘরেই রয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি শুনেছেন এখান থেকে শেষ কবে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছে?"

"শেষ গিয়েছিল বাবার সময়ে।"

"আপনার বাবা গিয়েছিলেন?"

"না। পা ভেঙে যাওয়ার পর ঠাকুরদার বাবাকে লোকজন ফিরিয়ে এনেছিল ঘরে। হাড় থেকে মাংস রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। খুব কষ্ট হয়েছিল মরার আগে। তিনি যাওয়ার আগে আদেশ দেন, ওঁর পরিবারের কেউ যেন ওই গুহার সন্ধানে না যায়। গেলে বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বলেছিলেন, ওই কাগজটার কথা ভুলে যেতে। এই কারণেই তাঁর পরে আর কেউ যেতে সাহস পায়নি।" বুড়ো বুড়িকে একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে আসতে বলল। সেটা নিয়ে এলে বুড়ো তার ভিতর থেকে অনেকগুলো ভাঁজ খুলে সুতো খসে আসা কাপড়ের ভিতর থেকে একটা পাকানো কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিল। দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করল।

আমি হতচকিত। এইরকম একটা ঘটনা ঘটবে তা কল্পনাই করিনি। আমার পকেটে তখন মাত্র কয়েকটা ভুটানি টাকা। রয়েছি গভীর জঙ্গলে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু এবং সভ্যতার বাইরে। আমার প্রবল ইচ্ছে এখান থেকে কোনওভাবে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার। এই সময়ে কাগজটা নিয়ে আমি কী করতে পারি? ওটা খুলে দেখলাম। যেহেতু পাকিয়ে রাখা হয়েছে, ভাঁজ পড়েনি তাই অতিপুরনো কাগজ হওয়া সত্ত্বেও সেটা বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। তাকাতেই বুঝতে পারলাম ওটা একটা ম্যাপ। ম্যাপের নিচটা, মানে যেখান থেকে পথের শুরু সেখানে তিনটি ঝরনা এসে মিলে একটা হয়ে নিচে নেমে গেছে। কীভাবে, কোন পথ ধরে যেতে হবে, তা রেখা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। নামগুলো যে ভুটানি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই নামকরণ করল কে? এদিকে তো মানুষের বাস নেই। বুড়োকে বললাম, "আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিলেন তা নিশ্চয়ই পালন করব। কিন্তু ওই গুহা থেকে আমার না ফেরা পর্যন্ত আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।"

বুড়ো ম্লান হাসল। মনে হল, ভাবছে, আমিই তো ফিরব না, তাই দেখার সুযোগ পাব না যে বুড়ো বেঁচে আছে কি না।

শেষপর্যন্ত ফিরে যাওয়ার চিন্তা আপাতত মন থেকে বাতিল করলাম। শূন্যহাতে ফিরে না গিয়ে দেখাই যাক না গুহা থেকে দু'হাত ভরে নিয়ে যেতে পারি কি না।

কিন্তু ওই পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি উঠে যাওয়া সোজা কথা নয়। কতদিন লাগবে, পথে কী কী বিপদ হতে পারে, খাবার কী পাওয়া যাবে তার খোঁজ-খবর পাওয়ারও তো কোনও সুযোগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওই তিন ঝরনার মিলনস্থল খুঁজে বের না করতে পারলে উপরে ওঠার জন্যে ম্যাপটা কোনও কাজে আসবে না। তাছাড়া আমি যে গুহাটার উদ্দেশে যাচ্ছি—তা গ্রামের কাউকে জানানো চলবে না। ফলে কাউকে আমি সঙ্গী হিসাবে পাচ্ছি না।

বুড়োকে এই সব কথা বললাম। সেই সকালে একটা বড় খরগোশ শিকার করেছিলাম আমি। বুড়ি তা আগুনে ঝলসে নুন লঙ্কা মিশিয়ে দিলে বুড়ো খানিকটা খেয়ে খুব ভাল মেজাজে ছিল। আমার কথা শুনে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক, ঠিক। তোমাকে নদীর মতো হতে হবে।"

"কী রকম?"

"নদী যখন প্রথমবার উপর থেকে নিচে নামে, তখন তার সামনে কোনও পথ থাকে না। তাকে পথ তৈরি করতে করতে নামতে হয়। তোমার বেলায় তার উল্টো। তোমাকে পথ তৈরি

করতে করতে উপরে উঠতে হবে। কিছু শুকনো ফল আছে, তাই নিয়ে যাও। আর খেয়াল রেখো, কাছাকাছি যেন ঝরনা থাকে, তাহলে জলের অভাব হবে না।" বলে বুড়ো বুড়িকে বলল, "ওকে বাবার ভোজালিটা দিয়ে দাও।"

দু'দিন পরে যখন অন্ধকার পাতলা হয়ে গেছে অথচ সূর্য ওঠেনি তখন বুড়োবুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেছনের জঙ্গলে ঢুকলাম। তখনও গ্রামের মানুষ গভীর ঘুমে মগ্ন। আমার যাওয়াটা কারও নজরে পড়ল না।

এই অবধি পড়ে মুখ তুলে তাকাল কুলদীপ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "টায়ার্ড লাগছে?"

"না, না। খুব ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে গল্পের বই পড়ছি।" কুলদীপ বলল।

"বেশ। তারপর কী হল?"

কুলদীপ হাসল, "এই ডায়েরি আপনি কোথায় পেলেন?"

"কেন?"

"এরপরে তো কিছু নেই। একদম সাদা পাতা। দেখুন।"

অর্জুন দেখল। ডায়েরির লেখা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। স্টিফেন অ্যালফোর্ড গুহার সন্ধানে জঙ্গলে ঢোকার পরে হয়তো একবারই কয়েকটা লাইন লিখেছিল কিন্তু তারপরে আর লেখেনি। লোকটা কতদূরে গিয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে নিশ্চয়ই ওই গুহার দেখা পায়নি। কিন্তু সেই তিন ঝরনার সন্ধান কি পেয়েছিল?

অর্জুন মাথা নাড়ল, খানিকটা হতাশ হয়ে। তারপর বলল, "যে এই অবধি লিখেছে সে খুব অসুস্থ এবং আহত অবস্থায় নাথুয়াতে এসে আমার মাস্টারমশাই-এর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল তাকে ভুটান পুলিশের কিছু লোক এই ম্যাপটার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে থেকে আর না পেরে যখন উদভ্রান্ত হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিতে আসছিল তখন হয়তো কোনও বন্যজন্তুর আক্রমণে আহত হয়। এই সময় তার মৃদু হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যায়। কোনওমতে সে নদী পেরিয়ে এসে মাস্টারমশাই-এর বাড়ির সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সেই স্টিফেন অ্যালফোর্ড মাস্টারমশাইকে এই ডায়েরি আর ম্যাপ দিয়ে অনুরোধ করে কাউকে না দিতে। খবর পেয়ে ভুটানের পুলিশ তাকে তাদের দেশে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করলেও শেষপর্যন্ত প্রাণরক্ষা হয়নি। মাস্টারমশাই আমাকে লিখেছিলেন, ছাই নিয়ে বসে আছি, তুমি যদি তা থেকে অমূল্যরতন পেতে পারো তাহলে তার কৃতিত্ব তোমার।"

কুলদীপ অর্জুনের কথা শুনতে শুনতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিল। এবার বলল, "বহুৎ ইন্টারেস্টিং।"

অর্জুন বলল, "আপনি পড়ে না দিলে আমি এই ডায়েরিতে লেখা কথাগুলো বুঝতেই পারতাম না।"

কুলদীপ হাত নাড়ল এমনভাবে যার অর্থ সে এমন কিছু করেনি। বলল, "এখন আপনি কী করবেন?"

"বুঝতে পারছি না।" অর্জুন বলল।

ডায়েরি ফেরত দিয়ে কুলদীপ বলল, "আমার খুব ইচ্ছে করছে ওই গুহাটাকে খুঁজে বের করতে। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হবে।"

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর বলল, "ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। প্রথমত, জায়গাটা আমাদের কাছে বিদেশ। স্টিফেন অ্যালফোর্ডের কথা সত্যি হলে ভুটানের পুলিশ এই ম্যাপ খুঁজছে গুহাতে পৌঁছবার জন্যে। ওরা নিশ্চয়ই চাইবে না বিদেশিরা ওদের আগে সেখানে পৌঁছাক।"

কুলদীপ মাথা নাড়ল, "ওরা জানতেই পারবে না। ডায়েরিতে লেখা আছে, জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে, সভ্যতার প্রায় বাইরে। পুলিশ নিশ্চয়ই সেখানে থানা তৈরি করে বসে নেই। তাছাড়া দাদা, আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা ভুটান সরকার জানে না। কয়েকজন পুলিশ অফিসার লোভে পড়ে ম্যাপটা হাতাতে চাইছে। তাদের এড়িয়ে গেলেই তো হবে।"

"কিন্তু ভুটান তো আমাদের কাছে বিদেশ।" অর্জুন বলল।

"তা হোক। ভুটানে যেতে আমাদের ভিসা দূরের কথা, কোনও অনুমতির দরকার হয় না।" কুলদীপ বলল।

"ঠিক আছে, ভেবে দেখি।" অর্জুন বলল।

অনেক ভেবে অর্জুন যখন এইরকম অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা নেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করছে না ঠিক তখনই মেজরের ফোন এল দিল্লি থেকে। তিনি দিন তিনেক আগে নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লিতে এসেছেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকার আমন্ত্রণে। সেখানে তাঁর কনফারেন্স আজ শেষ হচ্ছে। এত দূরে যখন এসেছেন তখন জলপাইগুড়িতে না গেলে মনখারাপ হবে। তিনি জানতে চাইলেন, অমল সোম এখন জলপাইগুড়িতে আছেন কি না। অর্জুন জানাল, অমল সোম এখন দেরাদুনে আছেন। কিন্তু হাবু তাঁর বাড়ি চমৎকার গুছিয়ে রেখেছে। মেজর এলে তাঁর পুরনো ঘরেই থাকতে পারবেন।

মেজর এলেন। অর্জুন দেখল বয়স বাড়লেও মানুষটার উৎসাহের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয়নি। দাড়ি আর একটু সাদা হয়েছে, এই যা। দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে বললেন, "হাই ইয়ংম্যান। নতুন কোনও কেস হাতে আছে?"

"এই মুহূর্তে নেই।" অর্জুন হাসল, "দু'মাস আগে শেষ কাজ করেছি। একটা আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারীদের শেষপর্যন্ত ধরা গিয়েছে।"

"ওঃ। আমি ভাবলাম দিন কয়েক এখানে থেকে তোমার সঙ্গে একটা কিছু করে মন গরম করে ফিরে যাব।" মেজর একটু হতাশ।

কথা হচ্ছিল অমল সোমের বাড়ির বারান্দায় বসে। হঠাৎ একটা বিশাল চেহারার কাঠবিড়ালি লাফিয়ে নামল বাড়ির বাগানে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর, "মাই গড, এই ভুটানি কাঠবিড়ালি এখানে কী করে এল। লুক, ওর মাথা শরীরে কালো ছাপ কিন্তু লেজটা সাদা।"

"এটা ভুটানি কাঠবিড়ালি?" অর্জুন অবাক।

"হ্যাঁ। সেন্ট পার্সেন্ট ভুটানি। ইন্ডিয়ানগুলো সাইজে ছোট হয় এবং লোমের রংও কালো সাদা হয় না। ইন্টারেস্টিং।"

মেজরের মুখে ভুটান শব্দটি শোনামাত্র স্টিফেন অ্যালফোর্ডের কথা মনে পড়ল অর্জুনের। সে ধীরে ধীরে মেজরকে বলতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "করেছ কি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"কেন?" অর্জুন অবাক।

"তুমি কি কল্পনা করতে পারছ না এই এক্সপিডিশন কী রকম হবে? লোকটা লেখেনি সেই গুহায় কী আছে? লিখেছে যা আছে তার সামান্য অংশ পেলে একজন রাজা হয়ে যেতে পারে! রাজা হোক বা না হোক, ওই ম্যাপ ধরে জায়গাটায় পৌঁছনোর কথা ভাবলেই আমার শরীরের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে উঠছে। লেটস গো।"

"কিন্তু অনেক সমস্যা রয়েছে।"

"সমস্যা না থাকলে আনন্দ হবে কী করে? রান্নায় নুন এবং লঙ্কা না থাকলে কি স্বাদ হয়?" মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন।

"ভুটানি পুলিশ যদি অপছন্দ করে? যদিও যেতে কোনও অনুমতির দরকার হয় না, তবু ওরা বিপদে ফেলতে পারে।"

"তুমি কি ওদের ঘরের দরজায় নক্ করে বলবে আমরা গুহা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি?"

"বেশ। আমরা ঠিক কতদিনে গুহায় পৌঁছব এবং ফিরে আসব তা জানি না। এর জন্যে রসদ, তাঁবু দরকার। সঙ্গে পোর্টার নিতে হবে। যতদূর মনে হচ্ছে এলাকাটায় সভ্যতা পৌঁছয়নি। তাই বন্যজন্তুদের আক্রমণের কথাও ভাবতে হবে। বুঝতেই পারছেন, এর জন্যে অনেক টাকা দরকার হবে।"

মেজর খানিকটা সময় দাড়িতে হাত বোলালেন। তারপর বুক পকেট থেকে পানীয়ের পাত্র বের করে গলায় ঢেলে বললেন,

"তোমার কী মনে হয় ছোকরা? আমি মরে গেছি?" চোখ বড় করলেন মেজর।

"এ কথা কি আমি মনে করেছি?" অর্জুন হেসে ফেলল।

"দাঁড়াও।" পকেট থেকে মোবাইল বের করে মেজর গোটা তিনেক ফোন করলেন। রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে ইংরেজিতে অভিযানের কথা বললেন। শেষ করে ফোন বন্ধ রেখে বললেন, "লেটস গো।"

"কোথায়?" অর্জুন অবাক।

"কী কী কিনতে হবে তার লিস্ট করো। আমি এবার অন্য ভূমিকায়।"

"কী ভূমিকায়?"

"ফটোগ্রাফারের। সঙ্গে দামি ক্যামেরাটা ভাগ্যিস এনেছিলাম। পুরো অভিযানের ছবি আমাকে তুলতে হবে। নিউ ইয়র্কের একটি ভ্রমণ পত্রিকা সব খরচ দেবে। অতএব মধ্যম পাণ্ডব, বিলম্বের আর দেরি করো না।" উঠে দাঁড়িয়ে দু'বার লাফিয়ে নিলেন মেজর। যেন এখনই তাঁর বিপুল দেহ সবল করবেন।

খবর পেয়ে কুলদীপ এসে গেল জলপাইগুড়িতে। অমল সোমের বাড়িটাই এখন ওদের বেসক্যাম্প। ঠিক হল তিনজন মালবাহক নেওয়া হবে চামুর্চি থেকে। তারা নেপালি। যদিও শেরপাদের দক্ষতা তাদের নেই কিন্তু মালপত্র পিঠে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। শিলিগুড়ি থেকে অর্জুনের পরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে চারটে তাঁবু ভাড়া করা হল। পাতলা কিন্তু অতি আধুনিক তাঁবু। বইতে কষ্ট হবে না। শিলিগুড়িতেই বিস্তর টিনফুড পাওয়া গেল। মেজরের ইচ্ছায় টুনা মাছের কৌটো নেওয়া হল অনেকগুলো। চাল, ডাল আলু, পেঁয়াজ, মশলা আর কয়েক ডজন ডিমের সঙ্গে কম্বল এবং স্লিপিং ব্যাগের জোগাড়ও হয়ে গেল। ঠিক হল কুলদীপ মালবাহকদের নিয়ে গয়েরকাটায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে। অর্জুনরা একটা ছোট ট্রাকে মালপত্র চাপিয়ে সেখানে পৌঁছে যাবে।

খবরটা মাকে বলেনি অর্জুন। ছেলে শহর বা গ্রামে গোয়েন্দাগিরি করে এটা তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এ সব করে যা রোজগার হয় তা তাঁকে দেয় অর্জুন। কিন্তু সেই ভুটানের জনমানবহীন পাহাড়ে, যেখানে সভ্যতা পৌঁছয়নি সেখানে ছেলে যাচ্ছে একটা গুহার সন্ধানে এটা তিনি মেনে নিতে পারবেন না। কাজটা করার জন্যে কেউ তাকে বরাদ্দ দেয়নি। মৃত্যুর আশঙ্কা আছে পায়ে পায়ে, এ কথা জানলে তো আরও বেঁকে বসবেন। তাই যাওয়ার আগের রাতে অর্জুন যখন বলল, মেজর তাকে নিয়ে ভুটানে যাচ্ছেন ছবি তুলতে তখন আপত্তি করতে পারলেন না। মেজর মানুষটিকে তাঁর ভাল লাগে। ওই বড়সড় চেহারার প্রবীণ মানুষটির মধ্যে মিষ্টি ছেলেমানুষি আছে। শুধু বললেন, "উনি যে ছবি তোলেন তা তো কখনও শুনিনি।"

ছাড়পত্র পেয়ে অর্জুন ভেবেছিল জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে কি না। যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়—; কিন্তু ব্যাপারটা বেশি জানাজানি করা ঠিক হবে না বলে সে দেখা করতে গেল না। তাছাড়া এসপি সাহেবের যাবতীয় ক্ষমতা এই জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভুটানে গেলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

দুপুরের পর ওরা জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হল। মেজর এখনই অভিযাত্রীর পোশাক পরে ফেলেছেন। তাঁর শার্ট-প্যান্টে এখনও গোটা আটেক বড় প্যাকেট, মাথায় টেক্সাস হ্যাট। গাড়িতে উঠে বসেই পকেট থেকে ধাতব পাত্র বের করে এক চুমুক খেয়ে নিয়ে বললেন, "ডোন্ট লুক ব্যাক। সামনে তাকাও।" তারপরেই তাঁর গলায় বিরক্তি ফুটল, "পৃথিবীর এত পরিবর্তন হচ্ছে অথচ তোমাদের দেশের এই ট্রাকগুলো বাবরের আমলে পড়ে আছে। প্রায় কাঠের উপর বসতে হচ্ছে, একটু নরম গদির ব্যবস্থা করতে পারে না?"

"এইটুকুই তো রাস্তা, এখনই শেষ হয়ে যাবে।" অর্জুন বলল।

"তার মানেটা কী? এরপরে তুমি ভুটানের জঙ্গলে আমার জন্যে রোলস রয়েসের ব্যবস্থা করে রেখেছ? হুঁঃ।"

কুলদীপকে বলা হয়েছিল গয়েরকাটার চৌমাথায় না দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে মেছুয়াপুলের কাছে অপেক্ষা করতে। জায়গাটায় কোনও জনবসতি নেই, দূরে একটি রিসর্ট তৈরি হয়েছে কিন্তু চালু হয়নি। ওখানে অপেক্ষা করতে বলার কারণ সাধারণ মানুষের কৌতূহল এড়ানো। মালপত্র নিয়ে একটা ট্রাক যাচ্ছে দেখলে কেউ কেউ প্রশ্ন করতেই পারত।

মেছুয়াপুলে ওরা পৌঁছেই কুলদীপদের দেখতে পেল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্যাগ। ট্রাকের পাশে এসে কুলদীপ বলল, "খারাপ খবর। একটা হাতির দল জঙ্গলের মাঝখানে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিক থেকে কোনও গাড়ি যাচ্ছে না, এদিকের গাড়িও ফিরে এসেছে।"

মেজর নেমে এলেন ট্রাক থেকে, "এটা কোনও খারাপ খবরই নয়। বরং খবরটা ভাল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের জন্যে।"

"হ্যাঁ স্যর, তবে সেটা কতক্ষণে হবে তা বলা যাচ্ছে না।" কুলদীপ বলল, "ওদের তো বিশ্বাস নেই।" অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য ঢলে পড়ছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সন্ধে নেমে যাবে। সে বলল, "কুলদীপ, হাতিরা আমাদের উপকারই করল। আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ওরা না থাকলে আমরা দিনের আলোয় নাথুয়াতে পৌঁছে যেতাম। এই ট্রাক থেকে মালপত্র নামাতে দেখত ওখানকার মানুষেরা। রাত নামলে স্যরের বাড়ির দিকে কেউ যায় না। তখন আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।"

"দ্যাটস রাইট। কিন্তু অর্জুন, তোমার ওই স্যরের বাড়িতে যারা থাকে—!"

"স্যর একাই থাকেন।"

"বাঃ। তাহলে তো ওঁর ওখানেই ডিনার করতে পারি আমরা।"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি আমাদের নেতা, যা বলবেন তাই করব।" অর্জুন বলল।

"থ্যাঙ্কু। যতক্ষণ ইন্ডিয়াতে আছি আমি দলের লিডার কিন্তু যেই ভুটানের মাটিতে পা রাখব অমনি তোমাকে দায়িত্বটা নিতে হবে।" মেজর বললেন, " আমার মনে হয় মাঝরাতে যাত্রা শুরু না করে চতুর্থ প্রহরে, আই মিন, ভোরের আগেই আমাদের স্টার্ট করা উচিত।"

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রাক জঙ্গলে ঢুকল। অন্ধকার এখনও পাতলা। দু'পাশের জঙ্গল থেকে তীব্র ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে। হেডলাইটের আলোয় দুটো হরিণকে দৌড়ে রাস্তা পার হতে দেখা গেল। হঠাৎ কুলদীপ বলল, "দাদা, এই জায়গা, ওঃ, মাই গড, আপনি না এলে মরে যেতাম।"

মেজর বললেন, "শাট আপ। একদম চুপ। আমি হাতির গন্ধ পাচ্ছি। বুঝলে অর্জুন, ধূমপান ছাড়ার পর থেকে আমার ঘ্রাণশক্তি বেড়ে গেছে।"

এতক্ষণে অর্জুনের খেয়াল হল। এবার মেজর ধূমপান করছেন না।

দিবাকর স্যরের বাড়িতে ওরা যখন পৌঁছল তখন পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকা। নাথুয়ার বাজারেও আলো দেখেনি। বোঝা যাচ্ছিল লোডশেডিং চলছে। ট্রাকের ড্রাইভার হাতজোড় করল। "আজ রাতে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিন।"

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "হোয়াই?"

"স্যর, ওই জঙ্গলের রাস্তায় একা ট্রাক চালিয়ে যেতে পারব না। হাতির সামনে পড়লে আমার বউ বিধবা হবে।" ড্রাইভার বলল।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে অর্জুন দেখল দরজা বন্ধ। কিন্তু তালা দেওয়া নেই। সে চেঁচিয়ে ডাকল, স্যর! আপনি কোথায়? আমি অর্জুন।'

এই সময় অন্ধকার থেকে দিবাকর স্যরের কথা ভেসে এল, "আসছি, তুমি হঠাৎ চলে এলে! একটু দাঁড়াও।"

অন্ধকারে স্যরকে স্পষ্ট বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি ওপরে উঠে হ্যারিকেন জ্বালার পর তাঁকে দেখন অর্জুন। হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরা। উপরে উঠে বারান্দায় যে বস্তুটি রেখেছিলেন সেটি একটা ছিপ এবং তার পাশে একটা সরু কাঠিতে কান বিঁধিয়ে রাখা আছে গোটা দশেক ইঞ্চি ছয়েক মাছ। অর্জুন অবাক গলায় বলল, 'স্যর, আপনি মাছ ধরতে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। এই শখটা এখানে এসে আমার হয়েছে। এসো, আসুন আপনারা।"

অর্জুন বুঝল স্যর একটু লজ্জা পেয়েছেন। সেই বাল্যকাল থেকে সে স্যরকে দেখে আসছে কিন্তু কখনও হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় দ্যাখেনি। তার মনে হল, একমাত্র মানুষই অতিদ্রুত নিজেকে বদলে ফেলতে পারে।

পোশাক পাল্টে স্যর পরিচিত বেশে ফিরে এলে অর্জুন পরিচয় করিয়ে দিল, "ইনি মেজর। অমলদার বন্ধু। নিউইয়র্কে থাকেন।"

নমস্কার করে স্যর বললেন, "বিলক্ষণ জানি। আপনাকে ছাড়া অর্জুনকে ভাবা যায় না। অভিযানে তো আপনারা পরস্পরের সঙ্গী।"

"মাই গড! আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন।" মেজর বললেন, "অর্জুনের কাছে আপনার কথা শুনলাম। ও তো আপনার খুব ভক্ত।"

অর্জুন কথা ঘোরাল, "স্যর। এর নাম কুলদীপ। চামুর্চিতে থাকে। যদিও ওর মাতৃভাষা পাঞ্জাবি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলে এবং ভুটানি পড়তে এবং বলতে পারে।"

কুলদীপ স্যরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

স্যর বললেন, "মনে হচ্ছে তোমরা তৈরি হয়ে এসেছ।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ স্যর। আমরা স্টিফেন অ্যালফোর্ডের ডায়েরিটা কুলদীপের মুখ থেকে শুনেছি। উনি আপনাকে যে ম্যাপ দিয়ে গিয়েছেন সেটা অনুসরণ করেই পৌঁছতে চাইছি।"

"দ্যাখো, এই চ্যালেঞ্জ তোমরা নিয়েছ বলে আনন্দিত হচ্ছি কিন্তু ভয়ও পাচ্ছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তোমরা সফল হও।" স্যর বললেন।

"ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।" ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু নয়। মেজর বললেন, "আমি মেরু থেকে মরুভূমি, আফ্রিকার গভীর জঙ্গল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ভয়ঙ্কর নদীতে বহুদিন কাটিয়েছি। ভুটান তো তার কাছে কিছুই নয়।"

স্যর হাসলেন, "আপনাকে একটুও অশ্রদ্ধা না করে বলি, ভুটানকে বলা হয় অনাবিষ্কৃত দেশ, কারণ ভুটানিরা চান না বাইরের মানুষ এসে তাঁদের দেশটাকে জেনে যাক। অর্জুন, তোমরা কোন পথে ভুটানে প্রবেশ করবে?"

"আমরা ভেবেছি যেহেতু স্টিফেন অ্যালফোর্ড ভুটানথেকে ওই নদী পার হয়ে আপনার কাছে এসেছিলেন তাই এখান থেকে নদী পার হয়ে ভুটানে ঢুকে পড়ব। আমরা রাত আড়াইটে নাগাদ রওনা হব যাতে অন্ধকারের আড়াল পাওয়া যায়।" অর্জুন বলল।

"একটু ভুল হবে। আমি আজ মাছ ধরতে গিয়ে দেখি ওপারের জঙ্গলে মানুষের আনাগোনা হয়েছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চিৎকারও কানে এসেছিল। স্টিফেন এই পথে পালিয়ে এসেছে বলে হয়তো পুলিশ ক্যাম্প করেছে ওখানে। ওদের মুখোমুখি হলে সমস্যায় পড়বে।" স্যর বললেন।

অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল। মেজর বললেন, "ঠিক কথা, কুমিরের জিভে হাত বোলালে সে তো চুমু খেয়ে ছেড়ে দেবে না।"

কুলদীপ এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার কথা বলল, 'স্যর, আমরা যদি আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে নদী পার হই? ওইদিকে কখনও মানুষকে দেখা গিয়েছে বলে শুনিনি।"

স্যর জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আপনাদের সঙ্গে তো মালপত্র রয়েছে। ওদিকের নদীর ধারে গাড়ি যাওয়ার মতো রাস্তা আছে কিনা আমি জানি না।"

কুলদীপ বলল, "নদী অবধি না যাওয়া গেলেও কাছাকাছি যেতে পারব।"

স্যর বললেন, "তাহলে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এখনই করা যাক।"

অর্জুন বলল, "আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে লোক আছে। আমরাই করে নেব। আপনিও তাই খাবেন।"

রাত একটা নাগাদ ওরা রওনা হল। ট্রাক ড্রাইভার কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। অত রাতে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি চালাতে সে সাহস পাচ্ছিল না। মেজর বললেন, "ওয়েল তোমার ভয়ের কারণ কী ব্রাদার?"

ড্রাইভার বলেছিল, "আপনারা তো নেমে চলে যাবেন। তারপর আমাকে তো একা ট্রাক চালিয়ে ফিরতে হবে। তখন?"

"খুব সিম্পল। তুমি ফিরবে না।" মেজর বললেন।

'মানে?' ড্রাইভার অবাক।

'জঙ্গলের মধ্যে ট্রাক ঢুকিয়ে রেখে তুমি আমাদের সঙ্গে ভুটানে যাবে।'

'ভুটানে?'

'হ্যাঁ। তাহলে তোমাকে একা ফিরতে হবে না।'

'ক'দিনের জন্যে যাবেন?'

'যাওয়ার পর বলতে পারব।'

লোকটা কিছু ভাবল। তারপর রাজি হল।

স্যরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হল। নথুয়া থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভয়ে ভয়ে ট্রাক চালিয়ে একসময় থেমে গেল ড্রাইভার।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "কী হল?"

"সামনে গাছ পড়ে আছে, ট্রাক যাবে না।"

মেজর জানতে চাইলেন, "এখান থেকে নদী কতদূরে?"

"খুব কাছে।"

হেডলাইটের আলোয় গাছটাকে দেখা গেল। এটা যে হাতিদের কীর্তি তাতে সন্দেহ নেই। এখন জঙ্গলের মাথায় দশমীর চাঁদ। হালকা জ্যোৎস্নার চারধার কী রকম রহস্যময়। মালবাহকরা মালপত্র সরিয়ে নিল ট্রাক থেকে। মেজর বললেন, "ওহে ড্রাইভার, ট্রাকটাকে কোথায় লুকোবে?"

"সাহেব, ভুটানে যে কদিন থাকবেন পার ডে দুশো টাকা দেবেন তো?"

"কেন?" মেজর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"নাহলে আমার হেভি লস হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে দেব। তোমাকে ওদের সঙ্গে মাল বইতে হবে। রান্না করতে হবে। সাতদিন, দশদিন যা লাগে তুমি পারডে দুশো পাবে।" মেজর যেন আচমকা উদার হয়ে গেলেন।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল না ড্রাইভার। সোজা এগিয়ে গিয়ে ট্রাকে উঠে বসল। তারপর কোনওরকমে ট্রাক ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরল।

মেজর অর্জুনকে বললেন, "দেখলে? ভয় উধাও হয় গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "এখন আমরা কী করব?"

"মানে?"

"আপনি অর্ডার না দিলে-।"

"ইয়েস।" মাথা নাড়লেন মেজর, "লেটস গো। নদী পার হওয়া যাক।"

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর নদীটাকে দেখা গেল। চওড়া নদী, ছোট পাথর আর বোল্ডারে নদীর বুক ঠাসা। জল বইছে ঠিক মাঝখান দিয়ে আর ওই প্রান্তের জঙ্গল ঘেঁষে। জঙ্গল ভুটানের।

জোছনায় বেশি দূরে দৃষ্টি যাচ্ছে না। কিন্তু হাঁটতে সুবিধে হচ্ছে। প্রথমে কুলদীপ, মেজর, অর্জুন পিছনে মালবাহকরা শুকনো পাথরে পা দিল। হাঁটার সময় নুড়িগুলো বালিতে বসে যাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরে ওরা নদীর মাঝখানে এসে জলের ধারার পাশে দাঁড়াল।

মেজর বললেন, "হুম। এটা নদী নয়, স্রেফ ঝরনা। লেটস গো।"

হাঁটুর উপর প্যান্ট গুটিয়ে ওরা একে একে জলে নামল। মেজরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল অর্জুন। ভাগ্যিস তিনি সবাইকে রবারের জুতো পরতে বলেছিলেন। জল হাঁটুর নিচে হলেও স্রোত তীব্র। শরীর নাড়িয়ে দিচ্ছে। মেজর তো একবার পড়ে যেতে যেতে বাঁচলেন, 'হরিবল হরিবল।'

অর্জুন বলল, "আপনি কি হরিবোল বললেন?"

"অ্যাঁ। দুটো একই কথা। তবে একটা জ্যান্ত মানুষ বলে আর একটা মরা মানুষ শোনো।"

জল পেরিয়ে আবার কিছুটা শুকনো বালির উপর দিয়ে হেঁটে নদীর দ্বিতীয় ধারার সামনে এল ওরা। এখানে স্রোত কম কিন্তু মনে হচ্ছিল জল কিছুটা গভীর। নদী পার হতে জল কোমরে পৌঁছল। প্যান্ট ভিজে শরীরে লেপ্টে গিয়েছে। মেজর বললেন, "আমরা এখন ভুটানে। এবার তুমি অর্ডার করো।'

অর্জুন হেসে ফেলল, "প্রথমে তো প্যান্ট পাল্টে নেওয়া দরকার।"

ফুলপ্যান্ট ছেড়ে ওরা তিনজন বারমুডা পরে নিল। কুলিরা কিন্তু হাফ প্যান্ট পাল্টাল না। বলল, "কুছ নেহি হোগা।"

ওরা দাঁড়িয়েছিল তিনদিকে জঙ্গল ঘেরা একটা বালি বালি জায়গায়। অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'আমরা ঠিক কোথায় আছি জানি না। এখনও ভোর হতে ঘণ্টা দুয়েক বাকি। তার আগে জঙ্গলে ঢোকা ঠিক হবে না। কুলদীপ, আপনি কী বলেন?"

কুলদীপ চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছিল। প্রশ্ন শুনে চোখ খুলে বলল, "ঠিক বলেছ দাদা। রাতের জঙ্গলে বিপদ হতেই পারে। কিছুই তো দেখা যাবে না। আমাদের ঠিক করে নিতে হবে কোন দিকে হাঁটলে ম্যাপ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে পৌঁছতে পারব।"

অর্জুন সবাইকে দু'ঘণ্টা বিশ্রামের কথা বলতেই অবাক হয়ে দেখল মালবাহকরা মালপত্তরে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে চোখ বন্ধ করল। কুলদীপ হেসে বলল, "এইভাবেই ওরা দু'ঘণ্টা আরামে ঘুমাবে।"

বুনো ঝোপের আড়ালে বালির উপর ওরা বসে ছিল। অর্জুন মুখ তুলে দেখল চাঁদের গায়ে ময়লাটে মেঘ জড়াচ্ছে। স্টিফেন সাহেব তাঁর ডায়েরিতে লিখে যাননি ঠিক কোনখান থেকে ম্যাপের পথ শুরু হয়েছে। কিন্তু যে গ্রামে তিনি আশ্রয় নিয়ে থেকেছেন, যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁকে ডায়েরি ম্যাপ দিয়েছিলেন সেই গ্রাম থেকে খানিকটা এগিয়ে ওই পথটাকে পেয়েছিলেন। স্টিফেন লিখেছেন সেই গ্রামের নাম টুংচি। অর্জুন জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে ভুটানের এই অঞ্চলের ম্যাপে টুংচির খোঁজ করেও পায়নি। গ্রামটি এত গুরুত্বহীন যে ম্যাপে দেখানো হয়নি। স্টিফেনের পালিয়ে আসার পথ অনুমান করলে টুংচি গ্রামটা নাথুয়া থেকে নদী পার হয়ে ভুটানের সীমানার কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে বলেই মনে হয়েছে অর্জুনের। ওই গ্রামে পৌঁছতে পারলে ম্যাপের পথ পেতে অসুবিধে হবে না।

স্টিফেন লিখেছেন ওই টুংচি গ্রাম থেকে কিছুটা গেলে তিনটে ঝরনা যেখানে একত্রিত হয়েছে সেখান থেকেই ম্যাপ-পথের শুরু। অতএব প্রথমে ওই গ্রামেই পৌঁছতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সে ভেবেছিল ভুটানে ঢোকার পর যেকোনও মানুষকে পেলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে টুংচি গ্রামের হদিশ পেয়ে যাবে।

হঠাৎ মেজরের চিৎকার কানে এল। অর্জুন আর কুলদীপ তাকিয়ে দেখল মেজরের হাতে একটা যন্ত্র এবং তিনি সেদিকে তাকিয়ে বলে যাচ্ছেন, "বাঃ, ব্রাভো! ভাগ্যিস এটাকে নিয়ে এসেছিলাম।"

অর্জুন এগিয়ে গেল মেজরের কাছে, "কী ব্যাপার?"

"তোমার ম্যাপ যদি ঠিক হয় তাহলে আমার কম্পাস বলছে আমাদের উত্তরদিকে যেতে হবে।" মেজর বললেন।

"উঃ। খুব ভাল হল।" অর্জুন স্বস্তি পেল।

ভোরের মুখে চা-বানাল মালবাহকরা। চা-বিস্কুট খেয়ে ওরা উত্তরদিকে রওনা হল। প্রথমদিকে জঙ্গল গভীর ছিল না কিন্তু কাঁটার জঙ্গল থাকায় পথ তৈরি করতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু তারপরেই আকাশ ছোঁয়া গাছ, মাটিতে শ্যাওলা পাথর, মাটি, মাঝে মাঝে বেতগাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওরা হাঁটছিল। টানা চারঘণ্টা হাঁটার পর অর্জুন বিশ্রাম করার কথা বলল।

পাখি ডাকছিল, হঠাৎ থেমে গেল তারা। তারপরেই দূরে গাছ ভাঙার আওয়াজ হল। মালবাহকদের একজন চাপা গলায় বলল, 'হাতি'।

সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস হয়ে গেল কুলদীপ, "এখান থেকে চলুন দাদা।"

মেজর আরাম করে বসে ছিলেন একটা গুঁড়ির উপর। বললেন, "এত ভয় পাওয়ার কী আছে! ওরা ওদের মতো আছে, আমরা আমাদের মতো থাকি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। আমাদের আর একটু এগিয়ে যাওয়া উচিত।"

মেজর বললেন, "তুমি ভেবো না, চারঘণ্টা হাঁটার ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কালাহারি মরুভূমিতে আমি একটানা দশঘণ্টা হেঁটেছিলাম। আমি হাতির চরিত্র জানি বলেই বলছি, ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

কিন্তু কুলদীপ মাথা নেড়ে বলল, "স্যর, আপনি বোধহয় আফ্রিকার হাতিদের দেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু ভারত-ভুটানের হাতির চরিত্র অন্যরকম। আমার অভিজ্ঞতা আছে। তাই আমরা যদি একটু এগিয়ে গিয়ে বিশ্রাম করি তাহলে মনে হয় ভাল হবে।"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর অত্যন্ত অনিচ্ছা নিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই অর্জুন তাঁর হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মেজর বললেন, "না না, হাত ধরতে হবে না। আমি একটুও ক্লান্ত নই। লেটস গো।"

প্রায় আধঘণ্টা ওরা হাঁটল। জঙ্গল আরও দুর্গম হয়ে উঠছে। উপর থেকে নেমে আসা ঝুরি, বেতের জঙ্গল সরিয়ে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর মধ্যে টিপটিপে বৃষ্টি হয়ে যেতেই অর্জুন একটা বড় পাথরের আড়ালে বিশ্রাম করতে নির্দেশ দিল সবাইকে।

তৎক্ষণাৎ মেজর পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। তারপর কুলদীপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই জঙ্গলে কী কী জন্তু আছে?"

"স্যর, হরিণ, খরগোশ, শেয়াল আর বড় বড় ইঁদুর এখানে প্রচুর আছে।"

"আঃ। আক্রমণ করতে পারে এমন প্রাণীদের কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

"ও। হাতি, নেকড়ে, বুনো শুয়োর, অনেকরকম সাপ, লেপার্ড দুই একটা—।"

"রয়েল বেঙ্গল টাইগার?"

"না স্যর। ওরা সুন্দরবনেই থাকে। নর্থ বেঙ্গলে আসে না, ভুটানে তো নয়ই। গভীর নিচে আছে, এই পাহাড়ে ওঠা ওরা পছন্দ করে না। আর আছে বাইসন। রেগে গেলে ওরা ভয়ানক হয়ে যায়।" কুলদীপ জানাল।

মালবাহকদের দু'জন রান্না চাপিয়ে দিয়েছিল। একজন গেল জলের সন্ধানে। কিছুক্ষণ পরে তার চিৎকার কানে আসতেই মেজর ছাড়া সবাই ছুটল সেদিকে। গিয়ে দেখল একটা বিশাল অজগর গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কোনও প্রাণীর দুটো পা। বিশাল হাঁ-মুখ বন্ধ হচ্ছে না কারণ যে প্রাণীটিকে গিলতে চেয়েছিল তার শিং গলার কাছে আটকে গিয়েছে। প্রাণীটিকে উগরে দিতে না পেরে মাঝে মাঝে ঝুলন্ত শরীর দোলাচ্ছে অজগর। অর্জুন কিছু বলার আগেই অন্য মালবাহকেরা ধারালো দা দিয়ে অজগরের গলা কাটার চেষ্টা করল। কয়েকবার আঘাত করতেই অজগর প্রচণ্ড আওয়াজ করে গাছ থেকে নিচে আছড়ে পড়ল। পড়ার চাপেই সম্ভবত, তার হাঁ-মুখ বন্ধ হয়ে পেট বিকট ফুলে উঠল। মালবাহকেরা প্রবল শক্তিতে আঘাত করে যাচ্ছিল। এবার অজগর তার লেজ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ওদের ধরার চেষ্টা করল। লেজ যেই এগিয়ে আসছিল অমনি মালবাহকেরা দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় অজগর দ্বিখণ্ডিত হলে মালবাহকরা উল্লসিত হল।

দেখা গেল সাপটা যে হরিণকে গিলেছিল, তার মাথার দুটো শিং চারভাগে ভাগ করা। যদিও শেষ সময়ে সেগুলো ভেঙে গেছে কিন্তু হরিণটাকে মৃত অথচ অক্ষত অবস্থায় বের করে আনা গেল।

মালবাহকেরা কুলদীপকে জানাল ওই হরিণ এবং অজগরের মাংস তারা সানন্দে খেতে পারবে। অর্জুন শুনেছিল সাপের মাংস পৃথিবীর অনেক মানুষ খেয়ে থাকে। যেহেতু অজগরের শরীরে বিষ নেই তাই খেলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অজগরের লালায় ভেজা হরিণটির মাংস খাওয়াকে সে সমর্থন করছিল না। কিন্তু কুলদীপ বলল, "চামড়া ছাড়িয়ে নিলে ওরা খেতেই পারে। কোনও ভয় নেই।"

প্রথমে হরিণটিকে কেটে টুকরো করে নিল মালবাহকেরা। তাদের বোঝা আরও বাড়ল। অজগরটাকে দড়ি বেঁধে নিল যাতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আজ জলপাইগুড়ি থেকে যা আনা হয়েছে তাই দিয়ে লাঞ্চ সেরে আবার হাঁটা শুরু হল। মেজর এখন একটু চাঙ্গা হয়েছেন। অজগর দেখে মাথা নেড়ে বললেন, "এমন কিছু বড় নয়।"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "এর চেয়ে বড় সাপ আপনি দেখেছেন?"

"অফ কোর্স। দক্ষিণ আমেরিকায়। আনাকোন্ডার নাম শুনেছ?"

"হ্যাঁ। ওই নামের একটা সিনেমাও দেখেছি।"

"মোস্ট ফেরোসাস সাপ। আমি প্রাণীহত্যা করা একদম পছন্দ করি না। কিন্তু ব্যাটা এমন করে ল্যাজ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ঠিক ওর জিভের ভিতর গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।" মেজর চোখ বন্ধ করলেন। যেন সেই ছবিটাকে দেখতে পেলেন।

"আপনি খুব ভাগ্যবান।" অর্জুন বলল।

"ভাগ্য সবসময় সাহসীদের সঙ্গেই থাকে হে।" মেজর বললেন।

একটু একটু করে উপরে উঠছিল ওরা। এখন জঙ্গল অত ঘন নয়। কিন্তু মেঘ ঝুলে রয়েছে আকাশে। হঠাৎ বাঁদরদের তীব্র চিৎকার শুরু হয়ে গেল। এই গাছ থেকে ওই গাছে লাফিয়ে যাচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

মেজর হাত তুলে থামতে বললেন সবাইকে। তারপর নিচু গলায় অর্জুনকে বললেন, "সাধারণত বাঘ বা সিংহ এলাকায় ঢুকলে ওরা এইভাবে চিৎকার করে। কিন্তু কুলদীপ বলল, এই জঙ্গলে ওরা নেই। তাহলে?"

"আপনারা দাঁড়ান, আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি।" অর্জুন বলল।

"তোমার কাছে অস্ত্র আছে?"

"না। এই লাঠিটাই আমার অস্ত্র।" অর্জুন নিঃশব্দে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। যে জায়গা থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল সেখানে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল। বাঘের মতো বড় চেহারার একটি প্রাণী যার চোখ টকটকে লাল কিন্তু চামড়ার রং কুচকুচে কালো। একটা গাছের নিচের ডালে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই এত চিৎকার তা এখন বুঝতে পারল অর্জুন। অর্জুন গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র জন্তুটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সে যে পছন্দ করছে না তা

বোঝানোর জন্য দাঁত দেখাল। অর্জুন লাঠিটাকে শক্ত করে ধরে মাথার উপর তুলতেই জন্তুটা উল্টোদিকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাঁদরগুলো শান্ত হয়ে গেল। ওখানে আর দাঁড়াতে ভরসা পেল না অর্জুন। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে এই জন্তু সে দেখেছে। এরা থাকে দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু ভুটানের পাহাড়ের এদিকে ওদের অস্তিত্বের কথা কারও মুখে শোনা যায়নি। এই কালো বাঘগুলো খুব হিংস্র হয়। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডে তো সেরকমই বলেছে।

ফিরে গিয়ে মেজর এবং কুলদীপকে কালো বাঘের কথা বলল অর্জুন। মেজর মাথা নাড়লেন, "ভুল দেখেছ। হয়তো ছায়া পড়েছিল তাই ওটাকে কালো বাঘ বলে মনে হয়েছে তোমার।"

কুলদীপও সায় দিল, "দাদা, জঙ্গলের বেড়াল খুব বড় হয়। ওখানে হয়তো কালো বেড়াল ছিল।"

অর্জুন কথা বাড়াল না কিন্তু তার মন থেকে অস্বস্তি গেল না।

মালবাহকেরা এগিয়ে যাচ্ছিল। অজগরকে টানছে দু'জন, পিঠে আঁটা বোঝা নিয়েও। হঠাৎ মেজর লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর গলা দিয়ে গোঙানি বের হল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "কী হল?"

"লুক। লুক অ্যাট মাই প্যান্ট।"

অর্জুন দেখল বেশ বড় বড় লালচে জোঁক মেজরের পায়ে ঝুলছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "এতক্ষণ টের পাননি?" সে নিচু হয়ে একটা কাঠি দিয়ে জোঁক ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। কয়েকটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে। তাদের দেখে মেজর বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ, বুঝলে অর্জুন।"

"মানে?" অর্জুন শেষ জোঁকটাকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"ব্লাডপ্রেসার এখন নর্মাল হয়ে গেল। এই পদ্ধতিটা বহু আগে চালু ছিল। আফ্রিকার কিছু উপজাতি আজও রক্তচাপ বেড়ে গেলে জোঁক দিয়ে রক্ত বের করে নেয়।" মেজর পায়ে হাত বোলালেন।

"এবার থেকে সতর্ক হয়ে হাঁটুন।" অর্জুন বলল।

দুপুরের একটু পরে অর্জুন দেখল, মালবাহকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এগিয়ে গিয়েছিল খানিকটা, কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করল কুলদীপ। একজন মালবাহক নিচু গলায় বলল, "সামনে একটা গ্রাম আছে। মানুষের গলা শুনতে পেলাম আমরা।"

কুলদীপ অর্জুনকে বললে সে সবাইকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে ন্যাড়া জমিতে পা রাখতেই সে ছোটখাটো খড়ের ঘর দেখতে পেল। দুটো ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েকটা অর্ধনগ্ন শিশু একপাশে খেলছিল। খেলা থামিয়ে অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগল।

অর্জুন হিন্দিতে তাদের কাছে ডাকতেই ওরা দুদ্দাড় করে পালাল। খড়ের ঘরের ভিতর থেকে কচি গলায় চেঁচামেচি হল এবং তারপরে পিলপিল করে বড়রা বেরিয়ে এসে অর্জুনকে দেখল।

দু'হাত উপরে তুলে অর্জুন হিন্দিতে বলল, "আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদের গ্রামে এসেছি।"

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। ওদের দলের যে প্রধান সে এক পা এগিয়ে যে প্রশ্ন করল তার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারল না অর্জুন। তিনবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে লোকটা হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। বাধ্য হয়ে অর্জুন পিছন ফিরে চিৎকার করে বলল, "কুলদীপ, আপনি একা চলে আসুন। অন্য সবাই ওখানেই থাকুন।"

কুলদীপ বেরিয়ে আসতেই লোকগুলো দ্রুত ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ল। চারধার নিঃশব্দ, এমনকী শিশুরাও আওয়াজ করছে না। বিদেশি দেখে ওরা এরকম ভয় পাবে তা আন্দাজ করতে পারেনি অর্জুন। সে কুলদীপকে বলল, "ওরা আমার হিন্দি বুঝতে না পেরে চলে যেতে বলছিল। আপনাকে দেখে তো দেখলাম ভয় পেয়ে গেছে। আপনি ভুটানি ভাষায় কথা বলুন, যদি ওরা বুঝতে পারে।"

কুলদীপ দুটো হাত মুখের দু'পাশে এনে চেঁচিয়ে যা বলতে লাগল তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না অর্জুন। প্রথম বারে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তিনবার কুলদীপ চেঁচিয়ে বলার পরে একজন একজন করে মানুষ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। তখন কুলদীপ অনেকটা স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে লাগল। অর্জুন দেখল এবার লোকগুলো মাথা নাড়তে লাগল। ওদের মুখ থেকে ভয়ের ভাবটাও কমে আসছিল।

কুলদীপ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নতুন মানুষদের ওরা চট করে অ্যাকসেপ্ট করে না। আমরা কি অজগর সাপটাকে উপহার হিসাবে ওদের দিতে পারি?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "নিশ্চয়ই।"

কুলদীপ এবার মানুষগুলোকে যা বলল তা শুনে সবাই একসঙ্গে অদ্ভুত আওয়াজ করল। অর্জুনের মনে হল এই আওয়াজটায় বিস্ময় ও আনন্দ মিশে আছে। কুলদীপ আবার পেছনে জঙ্গলের কাছে চলে গিয়ে মেজরের উদ্দেশে বলল, "স্যর। ওদের নিয়ে বেরিয়ে আসুন। আর কোনও সমস্যা নেই।"

প্রথমে মেজর, পরে মালবাহকেরা খোলা জায়গায় এলে অর্জুন বলল, "তোমরা মালপত্র মাটিতে নামিয়ে রাখো। আর সাপটাকে নিয়ে কুলদীপ সাহেবের সঙ্গে ওদের কাছে যাও।"

ততক্ষণে বিশাল অজগরটাকে দেখতে পেয়েছে গ্রামবাসীরা। এবার তাদের গলা থেকে উল্লাস ছিটকে উঠল। মালবাহকদের সঙ্গে সাপটাকে বয়ে নিয়ে গেল কুলদীপ। তারপর মালবাহকদের ফিরে যেতে বলল।

ওরা ফিরে গেলে দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে সাপটাকে দেখিয়ে সে কিছু কথা বলতেই কয়েকটি যুবক দৌড়ে এসে সাপের শরীর উপরে তোলার চেষ্টা করল। ওজন তাদের পক্ষে বেশি হয়ে গেছে দেখে আরও কয়েকজন এসে হাত লাগাল। এবার হাতে হাতে সাপটা চলে গেল ওদের বসতির এক প্রান্তে। আর তার সঙ্গে চলল বেশির ভাগ মানুষ যাদের মধ্যে মেয়েরাও রয়েছে।

তিনজন মানুষ সেদিকে না গিয়ে কুলদীপের সঙ্গে কথা বলছিল। এরাই বোধহয় এখানকার প্রধান। কুলদীপের কথা শুনে লোকগুলো এবার হাসল। তারপর হাত তুলে আর এক প্রান্তের একটা চালাঘর দেখিয়ে দিল। অর্জুন দেখল ওই ঘরে তিনদিকে দেওয়াল নেই, পেছনের দিকটা ছাড়া। মাথার উপর খড় জাতীয় কিছুর ছাউনি। কুলদীপ দু'বার মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে কাছে ফিরে এসে অর্জুনকে বলল, "ওরা আমাদের আজকের রাতের জন্যে এখানে আশ্রয় দিয়েছে। ভালই হল, কী বলেন?"

"খুব ভাল হল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন বলল।

"ভাগ্যিস সাপটা আত্মহত্যা করেছিল।" মেজর গম্ভীর গলায় বললেন।

অর্জুন অবাক হল, "তার মানে?"

"আরে, তুই যখন গিলতে পারবি না, তখন অত বড় শিংওয়ালা হরিণটাকে মুখে পোরা আর আত্মহত্যা করা যে সমান তা বুঝলি না? সাপটাকে বলছি।"

অর্জুন এবং কুলদীপ হেসে উঠল।

চালাঘরে আশ্রয় নিল ওরা। অর্জুন বলল, "আজ আর তাঁবু খাটাতে হবে না। সন্ধের মধ্যে রান্না শেষ করলে ভাল হয়। আমাদের স্লিপিং ব্যাগগুলো বের করে দিলেই চলবে। কুলদীপ, আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় জল পাওয়া যায়? দু'জন গিয়ে জল নিয়ে আসুক।

তিনজন শুতে পারে এমন একটা প্লাস্টিকের ভাঁজ করা শিট বের করে একজন মালবাহক পেতে দিল মাটির উপর। তিনটি স্লিপিং ব্যাগ রাখা হল একপাশে। দু'টো বালতি নিয়ে দু'জন চলে গেল কুলদীপের সঙ্গে। প্লাস্টিক শিটে বসে পড়ে মেজর বললেন,

"আগে এই হতচ্ছাড়া জুতো খুলে ফেলা যাক। আঃ, কী আরাম। কিন্তু এই গ্রামের নামই কি টুংচি? ওই স্টিফেন লোকটা কি এই গ্রামেই ছিল?"

অর্জুন বসে বলল, "মনে হয় না। স্টিফেনকে দেখা থাকলে ওরা আমাদের দেখে অত ভয় পেত না। এখন প্রশ্ন হল, আমরা যেখানে এসেছি সেখান থেকে ওই তিন ঝরনার সঙ্গম কতদূরে? এইরকম পাহাড়ে একবার ভুল পথে গেলে একেবারে গোলকধাঁধায় পড়তে হবে।"

যে দু'জন লোক চালাঘরে ছিল তারা নিজেদের মধ্যে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল। মেজর সেদিকে তাকালেন, "কী হয়েছে তোমাদের?"

"সাহেব একটা কথা বলি।" একজন এগিয়ে এল, "আমরা সাপটাকে মারলাম, এতদূরে বয়ে নিয়ে এলাম কষ্ট করে আর আপনারা ওটাকে ওই লোকগুলোকে দিয়ে দিলেন। অজগরের মাংস খেলে আয়ু বেড়ে যায়। আর দেওয়ার আগে আমাদের একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "সত্যি কথা। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ওদের সাপটাকে না দিলে আমাদের শেষ করে দিত ওরা। যতই অজগরের মাংস খাও কোনও লাভ হত-না। মন খারাপ কোরো না। জঙ্গলে যখন এসেছি তখন আবার আমরা অজগর পাব, তখন তার মাংস খেয়ে আয়ু বাড়িয়ে নিও।"

লোকদুটো মাথা নেড়ে মেনে নিচ্ছে দেখে মেজর বললেন, "তাছাড়া তোমরা যে একেবারেই অজগরের কিছু খেতে পাবে না তা তো নয়।"

লোকদুটো অবাক। একজন বলল, "আমরা কী করে খাব। খাবে তো ওরা।"

"শোনো, অজগরটা হরিণকে গিলেছিল। তাই হরিণের শরীরের ভিতরে অজগরের লালা, পেটের রস ঢুকে গিয়েছে। সেই হরিণের মাংস তোমরা নিয়ে এসেছ। ওই মাংস যখন তোমরা খাবে তখন অজগরের কিছুটাও তোমাদের পেটে যাবে।" মেজর সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন।

এবার লোকগুলোর মুখে হাসি ফুটল। একজন বলল, "আজ আমরা হরিণের মাংস রান্না করব। মাংস আর ভাত।"

অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি হরিণের মাংস খাবেন তো?"

"আমি রাতে ননভেজ খাই না। অমল সোমের বাড়িতে হাবু তাই নিরামিষ রান্না করে দিত। সত্যি কথা বলতে কী, যা খাওয়ার তা সন্ধে হওয়ার আগেই খেয়ে নিতে হয়। আমি কিছু মনে করব না ওরা যদি নিরামিষ রান্না করে দেয়।" বেশ উদাস গলায় বললেন মেজর।

রাত নামল। অর্জুন লক্ষ করল, এখানে ঘরে ঘরে আলো জ্বালার রীতি নেই। সেটা অবশ্যই অভাবের কারণে। যেদিকটায় ওরা সাপটাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেইদিকে খোলা আকাশের নিচে শুকনো কাঠে আগুন জ্বেলেছে ওরা। গ্রামের সব মানুষই জড়ো হয়েছে সেখানে। মাংস-পোড়া গন্ধ বাতাসে পাক খাচ্ছে।

চালাঘরে মালবাহকরা হ্যারিকেন জ্বেলে রান্না চাপিয়েছিল। কুলদীপ বলল, "এখান থেকে দশ মিনিট হাঁটলে যে ঝরনা আছে সেটা গিয়ে নিশ্চয়ই আরও দুটোর সঙ্গে মেশেনি। কারণ এই ঝরনাটা বয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে আর জলও খুব কম।"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "চওড়ায় কতটা?"

"বড় জোর দশ-বারো ফুট।"

অর্জুন একটু ভাবল। এমন হতে পারে, তিন ঝরনার মিলিত ধারা থেকে একটা শাখা বেরিয়ে এসেছে এদিকে। তারপরেই খেয়াল হল তার। ওই ম্যাপ যখন তৈরি হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই তিনটে ঝরনা একত্রিত ছিল। কিন্তু তারপরে এতগুলো বছর গিয়েছে, ওরা যে সেই একই অবস্থায় থেকে যাবে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কুলদীপ যখন বলছে যেখান থেকে ওরা জল নিয়ে এসেছে সেটা নিচের দিকে বয়ে গেছে তাহলে ওটাকে অনুসরণ করে উপরে উঠে গেলে হয়তো কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

অর্জুন সামনে তাকাল। দূরের আগুনে মানুষগুলোকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ওরা স্রেফ পুড়িয়ে নিয়ে সাপটাকে খাচ্ছে। এই সময় ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। বেশ শীতশীত করছিল অর্জুনের। ইতিমধ্যে মেজর স্লিপিং ব্যাগের ভিতর পা ঢুকিয়ে নিয়েছেন। অর্জুন বুঝল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এখানকার আবহাওয়া আরও শীতল হবে।

এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো লোক চালাঘরের কাছে চলে এল। একজন ভুটানি ভাষায় কিছু বলে কুলদীপের সামনে পাতার পুঁটলি রাখল। কুলদীপ বেশ খুশি খুশি গলায় জবাব দিলে লোকদুটো হেসে ফিরে যাচ্ছিল যখন তখন অর্জুন বলল, "ওদের জিজ্ঞাসা করুন তো এই গ্রামের নাম কী?"

কুলদীপ ভুটানি ভাষায় প্রশ্ন করতেই একজন উত্তর দিল, "সুংচি।"

লোকদুটো চলে গেলে কুলদীপ বলল, "স্টিফেন সাহেব গিয়েছিলেন টুংচি গ্রামে। আমরা এসেছি সুংচি-তে। নামের মিল আছে। তাই মনে হচ্ছে ওই টুংচি গ্রাম এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবে না। কিন্তু ওরা ভালবেসে অজগরের মাংস দিয়ে গেল। বলল রান্না করে নুন মাখিয়ে দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই টেস্ট করবেন না। স্যর কি করবেন?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "উনি রাতে নিরামিষ খান। ওদের জিজ্ঞাসা করুন।"

কুলদীপ মালবাহকদের বলল, "ওরা অজগরের মাংস দিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ খেতে চাও তাহলে খেতে পারো।"

যে লোকটা অর্জুনের কাছে অভিযোগ করেছিল, সে প্রায় লাফিয়ে এসে পাতার পুঁটলি তুলে নিল। পাতার আড়াল সরিয়ে পোড়া মাংস নাকের কাছে তুলতেই সে অদ্ভুত শব্দ করে পুরোটা মাটিতে রেখে দিয়ে চালাঘরের বাইরে গিয়ে ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। ওর সঙ্গীরা খুব হাসছিল অবস্থা দেখে। কোনওমতে নিজেকে সামলে ফিরে এসে জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে লোকটা বেশ জোরে জোরে বলল, "কী দুর্গন্ধ। আমার পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই ব্যাটারা রাঁধতে জানে না, কিন্তু ওগুলো খাচ্ছে কী করে তা ভগবান জানেন।"

কুলদীপ জিজ্ঞাসা করল, "বাকিরা কি টেস্ট করবে?"

"না।" একসঙ্গে শব্দটা উচ্চারিত হল।

"তাহলে দয়া করে পিছনের মাটিতে গর্ত করে ওটাকে পুঁতে ফ্যালো। ওরা যেন পরে জানতে না পারে যে আমরা মাংস খাইনি।" কুলদীপ বলল।

রাত ন'টাতেই মনে হচ্ছিল কোন আদিম পৃথিবীতে চলে গিয়েছে ওরা। মাঠের শেষে যে আগুন গ্রামের মানুষ জ্বেলেছিল, তা ছাই হয়ে গিয়েছে। আকাশে মেঘ থাকায় আজ চাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে ঘরে মানুষগুলো নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। একমাত্র মেজর নাক ডেকে চলেছেন স্লিপিং ব্যাগের ভিতর শুয়ে। মালবাহকরা কম্বল মুড়ে ঘুমের অতলে। হ্যারিকেন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাত, ডাল আর আলুর তরকারিতে পেট ভরিয়ে কুলদীপও এখন ঘুমাচ্ছে। এই ছেলেটা সঙ্গী হিসাবে খুব ভাল। ট্রাকের তলা থেকে বের করার সময় ওকে যেরকম নার্ভাস দেখেছিল অর্জুন, এখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অর্জুনের ঘুম আসছিল না। তিন ঝরনার সঙ্গমে না যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে। তারপর তো ম্যাপ ধরে এগিয়ে যাওয়া। ওরা ঠিক পথে এগোচ্ছে তো? কুলদীপকে

বলতে হবে কাল সকালে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে। ওদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সঙ্গমস্থলের কথা জানে।

জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। অচেনা শব্দ। একটা রাতপাখি কর্কশ গলায় ডাক শুরু করল। এখানে সম্ভবত হাতিরা হানা দেয় না। দিলে গ্রামের ঘরগুলো আস্ত থাকত না। স্লিপিং ব্যাগে আশি ভাগ শরীর ডুবিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার একসময় যেন পাতলা হয়ে আসছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন শব্দ ভেসে আসছে যে চমকে চমকে উঠছিল অর্জুন।

অর্জুনের মনে হল এইভাবে সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হবে না। একটা ব্যাপারে সে অবাক হয়েছিল। মালবাহকরা যখন হরিণের মাংস রাঁধছিল, তখন তার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়েছিল। মেজর পর্যন্ত বলেছিলেন, "বেড়ে গন্ধ ছাড়ছে হে।"

অর্জুন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, "একটু টেস্ট করবেন না কি?"

"নাঃ। আমি এক কথার মানুষ।" বলে মেজর উল্টোদিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন অবাক হয়েছিল, কারণ এই গন্ধ নিশ্চয়ই গ্রামবাসীরাও পেয়েছিল। কিন্তু তারা একটুও কৌতূহল দেখায়নি। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মালবাহকেরা যে সব জিনিস বয়ে নিয়ে এসেছে তা ওরা কখনও চোখে দেখেনি। পাহাড়ি গ্রামের মানুষ সাধারণত সৎ হয়ে থাকে কিন্তু ব্যতিক্রম থাকবে না এটা বলা যায় না। ভোরে যদি দেখা যায় অনেক কিছু উধাও হয়ে গেছে তাহলে কিছুই করার থাকবে না। চুরির অভিযোগ করলে এদের সঙ্গে ঝামেলা বাধবে। তার চেয়ে সতর্ক থাকাই উচিত। তাছাড়া এরকম খোলা চালাঘরে, যার পিছনে গভীর জঙ্গল, সবাই ঘুমিয়ে থাকাও তো নিরাপদ নয়। অর্জুন কুলদীপের ঘুম ভাঙাল। বলল, "সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সমস্যা হতে পারে। আমাদের উচিত রাত জেগে পাহারায় থাকা। এখন থেকে রাত দেড়টা আবার দেড়টা থেকে ভোর, আপনি কখন জাগতে পারবেন?"

"জেগে থাকার দরকার আছে কি?" কুলদীপের গলায় ঘুম।

"নিশ্চয়ই আছে। মেজরের বয়স হয়েছে তাই ওকে ডিস্টার্ব করছি না।"

"তাহলে আমাকে দেড়টার সময় ডেকে দেবেন।" কুলদীপ পাশ ফিরল।

এখন বাইরে বেশ শীত। চালাঘরের ভিতরেও শীতের দাঁত বোঝা যাচ্ছে। যদিও স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢোকানো শরীর সেটা টের পাচ্ছে না। খাওয়া দাওয়ার পর ফুলহাতা সোয়েটার বের করে রেখেছিল অর্জুন, এখন সেটা পরে নিল।

টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়া মাত্র ঠান্ডা আরও বেড়ে গেল। চেয়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনিও আসছিল। ওঃ, এই সময় একটা সিগারেট ধরালে কী ভাল হত। মাঝেমধ্যে যে সে ধূমপান করে না তা নয়, কিন্তু সেটা অত্যন্ত অনিয়মিত। আর মেজর সঙ্গে থাকবেন জেনে সিগারেট সঙ্গে আনেনি অর্জুন। আশ্চর্য ব্যাপার, মেজর এবার একদম ধূমপান করছেন না।

হঠাৎ জঙ্গলে শব্দ শুরু হয়ে গেল। ওরা যে পথে এই গ্রামে এসেছিল সেদিকের জঙ্গলে। যেন কেউ বা কারা গাছের ডাল নির্মমভাবে ভেঙে চলেছে। কান খাড়া করে অর্জুন বুঝল ওটা হাতিদের কাজ নয়।

আওয়াজটা এগিয়ে এলে হঠাৎই গ্রামটা জেগে উঠল। ঘরে ঘরে মানুষগুলো চিৎকার শুরু করে দিল। তারপর অন্ধকারেই তারা বাইরে বেরিয়ে এসে যে যেমন পারে শব্দ করতে লাগল। একটা ফেঁসে যাওয়া ঢাকের আওয়াজও শোনা গেল। এই সম্মিলিত চিৎকারে চালাঘরের সবার ঘুম ভেঙে গেল। মেজর বিরক্ত হয়ে বললেন, "হোয়াট ননসেন্স। এ ব্যাটাদের কী হল?"

অর্জুন চাপা স্বরে বলল, "কোনও বন্য জন্তু গাছ ভেঙে এগিয়ে এসেছে গ্রামের দিকে। আস্তে কথা বলুন।"

মেজর এবার সোজা হয়ে বসলেন, "কী জন্তু?"

"বোঝা যাচ্ছে না। তবে হাতি বলে মনে হচ্ছে না। আর জন্তুটা বোধহয় প্রায়ই হামলা করতে এখানে আসে।" অর্জুন বলল।

"সেটা কী করে বুঝলে?" মেজরের গলার স্বর খাদে।

"গ্রামের লোক যেভাবে চেঁচিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে শব্দ করছে, তা দেখে মনে হচ্ছে এই কাজটা এরা আগেও করেছে, আজ নতুন নয়।" বলতে বলতে অর্জুন শুনল গাছ ভাঙার আওয়াজ কমে যাচ্ছে আর মানুষগুলো যেন সাহস পেয়ে আরও একটু এগিয়ে গেল। তারপর জয়ের উল্লাস শোনা গেল তাদের গলায়। যাদের আগমনে ওরা ভয় পেয়েছিল, তারা পালিয়েছে।

মেজর বললেন, "যাই বলো, ওরা হাতিদেরই তাড়াল।" তিনি আবার স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

রোদ ওঠার আগেই আকাশ আঁধারমুক্ত হয়। ওরা উঠে পড়ল। চা খেয়ে রওনা হবে। কুলদীপ গেল গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে। যদি ঝরনার সঙ্গম কোথায় তা জানা যায়।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "অর্জুন তুমি নিশ্চয়ই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করো না?"

সাতসকাল হওয়ার আগেই এমন প্রশ্নে হেসে ফেলল অর্জুন, "একবার তাঁদের না দেখলে মনে কী করে বিশ্বাস জন্মাবে বলুন?"

"হুম্। চা খেয়ে আমি আজ পাইপ ধরাব।" মেজর বললেন।

"আপনাকে তো এবার ধূমপান করতে দেখিনি।"

"আমরা যা দেখি না সেটাই শেষ কথা নয়। এই পাহাড়-জঙ্গলের আমি আর শহরের আমি কি এক মানুষ? নো, নেভার।" একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ধরা যাক, ওই ম্যাপ ফলো করে শেষপর্যন্ত আমরা গুহাটার মুখে পৌঁছলাম। স্টিফেন লিখে গিয়েছে ওই গুহা পাহারা দেয় যে সব প্রেতাত্মারা তারা কোনও বিধর্মীকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। ধরে নিচ্ছি ভুটানিরা বৌদ্ধ। তাহলে তুমি বা আমি বিধর্মী। কিন্তু বৌদ্ধরা তো খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বুদ্ধ তো শান্তির উপাসক। মরে যাওয়ার পর সেই ধর্মাবলম্বীরা কেন অন্য ধর্মের মানুষদের উপর ক্ষিপ্ত হবে। তাছাড়া আমার কী ধর্ম তা তারা জানবে কী করে? আমি তো বুদ্ধের অনেক বাণী, অনেক বৌদ্ধস্তোত্র জানি। ইন্টারেস্টিং।"

"আপনি ধরে নিচ্ছেন ওই গুহায় প্রেতাত্মা বাস করছে।"

"আমরা তো গিয়ে দেখিনি।" মেজর বললেন।

অর্জুন বুঝতে পারল কেন মেজর তাকে পাইপ খাওয়ার ব্যাপারে বললেন, আমরা যা দেখিনি সেটাই শেষ কথা নয়। অর্জুন মাথা নাড়ল। মনে মনে বলল, দুটো এক ব্যাপার নয়। তুলনাটা জমল না।

কুলদীপ ফিরে এল উত্তেজিত হয়ে। চায়ের মগ তুলে নিয়ে বলল, "ওরা যা বলল, তাতে মনে হচ্ছে আমাদের উত্তরদিকের পাহাড় ধরে উঠতে হবে। সূর্য যখন মাথার উপর আসবে তখন যে ঝরনাটার দেখা পাব তাকে অনুসরণ করলেই তিন ঝরনার মিলনস্থলে পৌঁছনো যাবে। যে লোকদুটো এই কথা বলল তারা গিয়েছিল বহুদিন আগে। ওরা তিনজন ছিল। একজনকে সাপ গিলে নেয় বলে বাকিরা পালিয়ে এসেছে। আর যায়নি।" চায়ে চুমুক দিল কুলদীপ।

অর্জুন খুশি হল, "যাক। একটা হদিশ পাওয়া গেল।"

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ধারণা ওরা কনফার্ম করেছে?"

"না স্যর।" মাথা নাড়ল কুলদীপ। "কাল রাতে হাতি আসেনি।"

"তাহলে?" মেজর চোখ ছোট করলেন।

"ওরা নাম বলতে পারল না। বলল, মানুষের মতো লম্বা ভয়ঙ্কর জন্তু। কালো লোমশ শরীর। দু'বার এই গ্রামে হানা দিয়েছে ওদের দু'জন। ওদের কথা গ্রামের মানুষ আগে কখনও শোনেনি। জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে আসে। প্রথম দু'বারে ওরা ভেবেছিল নিচে হাতির দল এসেছে। প্রথম দু'বারে কৌতূহলী হয়ে দেখতে যাওয়ায় কয়েকজনের মধ্যে থেকে দু'জনকে তুলে

নিয়ে গিয়েছেল ওরা। আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে গাছ ভাঙার শব্দ পেলেই ওরা সবাই মিলে চিৎকার করে। যে যেমন পারে শব্দ করে। তাতে দেখা গেছে জন্তু দুটো এদিকে আসতে সাহস না পেয়ে পালিয়ে যায়। দিনের বেলায় কখনওই ওদের দেখা যায়নি। রাতের অন্ধকারে খাবারের অভাব হলেই এদিকে চলে আসে।"

"চুপচাপ না এসে গাছের ডাল ভাঙে কেন ওরা?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল। কুলদীপ মাথা নাড়ল, "তার কারণ গ্রামবাসীরা জানে না।"

মেজর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সবাই যখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখনও তিনি চিন্তামগ্ন। তারপর পাইপ বের করে পাউচ থেকে তামাক বের করে আগুন জ্বালিয়ে দু'বার ধোঁয়া ছেড়েই চেঁচিয়ে বললেন, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে।"

"কী মনে পড়ল আপনার?" অর্জুন উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারল না।

"বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া পড়তেই মেমরি পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টি এইটে বিখ্যাত অভিযাত্রী মাইকেল নর্টনের নেতৃত্বে আমরা নায়রোবি থেকে মাসাইমারা হয়ে যখন একটা পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছেছিলাম, তখন দেখেছিলাম বিকেল হতেই সব ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। শুধু গ্রামের দু'পাশে অনেক উঁচু মাচার উপর ঝোলানো দুটো বিশাল ঘণ্টা বেজে চলেছে। চারজন লোক পালা করে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আমি ওদের ভাষা একটু জানতাম বলে নর্টন সাহেব আমাকেই পাঠালেন ব্যাপারটা কী জানতে। ওই উঁচু মাচায় বসে থাকা লোকদের মুখে আমি এই রকম জন্তুর কথা শুনেছিলাম। কালো লোমশ শরীর। গরিলা নয় কিন্তু তাদের মতো ঝুঁকে হাঁটে। মানুষের মাংস খেতে ওদের খুব ভাল লাগে। ওরা শুধু শব্দ শুনলে ভয় পায়। নইলে দশটা মানুষ ওদের একটার সঙ্গে পেরে উঠবে না। হা হা হা। কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় ভুটান। বুঝলে অর্জুন, পৃথিবীটা বড় ছোট জায়গা।" মেজর আবার ধোঁয়া ছাড়লেন।

কুলদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আফ্রিকায় অভিযানে গিয়েছিলেন?"

দু'সেকেন্ড কুলদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মেজর বললেন, "আমি প্রথমবার অভিযানে যাই আলাস্কায়। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে বসে টানা তিনদিন। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর ঠান্ডা সেখানে। শক্ত বরফ খুঁড়ে গর্ত করতেই দু'হাত ভিজে জল। মাইনাস পঞ্চাশ হবে সেই জলের তাপ। মোটা সুতোয় বড়শি বেঁধে তাতে টুনা মাছ বেঁধে দশ মিনিটের মধ্যে যে মাছটাকে টেনে উপরে তুলেছিলাম তা আমাদের তিনদিনের খাবারের অভাব মিটিয়েছিল। লেটস গো।"

অর্জুন লক্ষ করল তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেখেও কেউ এদিকে এগিয়ে এল না। অর্থাৎ বিদায় জানাবার সৌজন্য জানানো এদের জানা নেই। কিন্তু যখন ঘরগুলোর পিছন দিক দিয়ে ওরা পাহাড়ে উঠছে তখন মহিলা কণ্ঠের সম্মিলিত কান্না শোনা গেল। মহিলারা খুব আন্তরিকভাবে চেঁচিয়ে কাঁদছেন। অর্জুন দাঁড়িয়ে কুলদীপের দিকে তাকাল। "নিশ্চয়ই এইমাত্র ওদের কেউ মারা গিয়েছে। তার জন্যে ব্যস্ত ছিল বলে ওরা আমাদের বিদায় জানাতে আসেনি। ওরা আমাদের রাতে থাকতে দিয়েছিল তাই আমাদের উচিত ওদের সমবেদনা জানানো।"

কুলদীপ মাথা নেড়ে চলে গেল নিচে। মহিলাদের কান্না থেমে গেল একটু পরে। মেজর দার্শনিকের গলায় বললেন, "জন্মালেই মরতে হবে ভাই। জন্মমাত্রই জার্নি টুওয়ার্ডস ডেথ শুরু হয়ে যায়।"

কুলদীপ ফিরে এল হাসতে হাসতে। বলল, "দারুণ খবর।"

মেজর বললেন, "কারও কান্নার মধ্যে দারুণ খবর কী করে থাকে জানি না।"

"স্যর। ওই মহিলারা আমাদের কথা ভেবে কাঁদছেন।" কুলদীপ হাসল।

"আমাদের কথা ভেবে কেন কান্না আসছে?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"ওদের ধারণা আমরা আর ফিরে আসব না। ওদের একজন সঙ্গমের কাছাকাছি গিয়েই মারা গিয়েছিল। সঙ্গমে পৌঁছলে বাকি দু'জনই মারা যেত। আর যেহেতু আমাদের মরণ সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাই আমাদের ফিরে আসা অসম্ভব। সেই শোকে কাঁদছেন এঁরা কারণ মরার পর তো সেখানে কেউ ভাল করে কান্নার জন্যে থাকবে না। চলুন।" কুলদীপ চলা শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে জঙ্গল কমে গেল। ন্যাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় গতি কমে গেল ওদের। অর্জুন দলটার আগে যাচ্ছিল। কিছুটা যাওয়ার পর মেজর কম্পাসে চোখ রেখে বললেন, "উত্তরে যেতে হলে আমাদের ডানদিকের পাহাড় পেরোতে হবে।"

অর্জুন তাকিয়ে দেখল, ডানদিকে একেবারে খাড়া পাহাড়। এত মালপত্র নিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সে এগিয়ে গেল দলটাকে ওইখানে অপেক্ষা করতে বলে। হঠাৎ কোত্থেকে একদল হনুমান লাফিয়ে নামল সামনে। মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাতে লাগল অর্জুনকে। অর্জুন লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যেতেই ওরা দুদ্দাড় করে পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেল। যেন আচমকা মিলিয়ে গেল হনুমানগুলো।

অর্জুন একটু ভাবল। চোখের সামনে থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়া শুধু ম্যাজিকেই সম্ভব। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল যেখান থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তার চোখে পড়ল ফাটলটা। ফাটলের মুখ ছোট, দুটো মানুষ ঢুকতেই পারে কিন্তু তার ভেতরটা বড় এবং অন্ধকার হলেও দূরে যেন সেটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে ফাটলটাকে দেখাল অর্জুন। হনুমানগুলো এই পথ দিয়েই চোখের আড়ালে চলে গেছে। নিশ্চয়ই এই গুহার অন্য প্রান্তে গেলে সূর্য দেখা যাবে। ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে বলতেই মেজর মাথা নাড়লেন, "আমাদের সঙ্গে তো মাস্ক নেই।"

"কেন? মাস্কের কী দরকার?"

"হনুমানগুলো ভিতরে আছে। ওরা যখন মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন আমাদের কী দুরবস্থা হবে ভেবে দেখো। না না, তার চেয়ে অন্য কোনও পথ আছে কি না খুঁজে দেখা যাক।" মেজর বললেন।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। বলল, "চেয়ে দেখুন। আমাদের উত্তর দিকে যেতে হলে হয় ওই উঁচু পাহাড় ডিঙোতে হবে নয় তো বেশ কয়েক মাইল হেঁটে পাহাড়টাকে ঘুরে ওপাশে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে। আমাদের কারও রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং নেওয়া নেই।"

"আমার আছে। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টি ফোরে আমি আল্পসে গিয়ে তিনমাসের কোর্স করেছিলাম।" মেজর বললেন।

"আঠাশ বছর আগে আপনার শরীর যেরকম ছিল এখন কি সেরকম আছে?"

"তখন ওজন ষাট কেজি ছিল।"

"এখন অন্তত একশো দশ।"

"বাড়িয়ে বলছ। জাস্ট একশো।"

"ঠিক আছে। কিন্তু মালবাহকরা কী করে ওজন নিয়ে খাড়া পাহাড়ে উঠবে।" অর্জুন বলল, "কুলদীপ, এই সুড়ঙ্গের মুখটাকে বড় করে দিলে ভিতরে ঢুকে দেখা যেতে পারে ওটা কোথায় শেষ হয়েছে। পাহাড় ঘুরে যদি যেতে হয় তা এটা দেখার পর যাব।"

কুলদীপের সঙ্গে মালবাহকেরা হাত লাগাল। ওরা কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মুখটা বড় হল। ভিতরে পা দেওয়া মাত্র অর্জুনের কানে হনুমানদের চিৎকার ভেসে এল। এই সুড়ঙ্গে অর্জুনদের ঢোকা পছন্দ করছে না। মেজর বললেন, "অর্জুন, তুমি আর আমি আগে রেডি করে আসি তারপর বাকিরা যাবে কি না ঠিক হবে।"

কুলদীপ মাথা নাড়ল, "আমি ওদের সঙ্গে এখানে থাকছি। দরকার হলে মোবাইলে যোগাযোগ করবেন।"

অর্জুন মোবাইল বের করে দেখল ওটা অকেজো হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মোবাইল কি চালু আছে?"

নিজের মোবাইল দেখে হতাশ হল কুলদীপ। "নাঃ টাওয়ার নেই। ও, ভুটানের ভিতর ইন্ডিয়ান সিমকার্ড বোধহয় অচল। অথচ আমাদের ওখানে সামচিতে এরকম হয় না। ঠিক আছে, গুড লাক।"

পিঠের ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে এগোল অর্জুন, সঙ্গে মেজর। গুহার নিচের দিকটা স্যাঁতস্যাঁতে। বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝে জল গুহায় পড়ে এখান দিয়ে। বড়জোর হাত দু'য়েক চওড়া কিন্তু ক্রমশ নিচু হতে হচ্ছিল উচ্চতা কমে যাওয়ায়। যত ওরা এগোচ্ছিল তত হনুমানরা জোরে চেঁচাচ্ছিল, হঠাৎ তারা চুপচাপ হয়ে গেল। টর্চের আলোয় তাদের দেখতে পাচ্ছিল না অর্জুন। প্রায় পনেরো মিনিট মাথা নিচু করে হাঁটার পর অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। তার টর্চের আলোয় সাপটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুচকুচে কালো সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে বারংবার জিভ বের করছে তাদের দিকে তাকিয়ে। অর্জুন লক্ষ করল সাপটা যেখানে খাড়া হয়েছে সেখানে আরও অনেকগুলো বাচ্চা কিলবিল করছে।

অর্জুন চাপা গলায় বলল, "কী করা যায়? এগোন উচিত হবে না। এইরকম প্রায় মাজা-ভাঙা অবস্থায় ওটাকে মারাও যাবে না।"

মেজর বললেন, "লাঠিটা আমাকে দাও।"

অর্জুনের হাত থেকে লম্বা লাঠিটা নিয়ে মেজর তাঁর পাইপটা লাঠির ডগায় রুমাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "ওর মুখে টর্চের আলোটা রাখো, সরাবে না।"

মেজর মাথা নিচু করে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন লাঠি উঁচিয়ে ধরে। নাগালের মধ্যে পেয়ে সাপটা তীব্র গতিতে ছোবল মারল লাঠির ডগায়। তার মুখ থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ ঘনঘন বের হচ্ছিল। মেজর আর এক পা এগোলেন। সাপটা পিছনের দিকে হেলে গিয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হতেই মেজর লাঠি ও পাইপের মাঝখান দিয়ে ওর গলায় চেপে ধরতেই সাপটা দ্রুত মেঝের উপর মাথা নামাল। মেজর ততক্ষণে লাঠি ও পাইপের ত্রিকোণে চেপে ধরলেন সাপের মাথাটা মেঝের উপর। তারপর দ্রুত নিচু হয়ে সাপের মাথার নিচটা মুঠোতে ধরে উপরে তুললেন।

অর্জুন বলল, "দারুণ। দারুণ কাজ করলেন আপনি।"

সাপটাকে মুঠোয় ধরতেই সেটা লেজ দিয়ে মেজরকে জড়াতে চাইছিল। মেজর বললেন, "এখন এটাকে নিয়ে কী করবে? নিচেরগুলোকে একেবারে নিরীহ ভেবো না।"

"ওটাকে নিয়ে ফিরে যাই চলুন।"

"ফিরে যাব?"

"ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের নিয়ে আসা যাক।"

সাপ দেখে কুলদীপ চোখ বড় করল। মালবাহকেরা উল্লসিত। কিন্তু মেজর তাদের হতাশ করে সাপটাকে দূরের খাদে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, "ওর তো কোনও দোষ নেই। মিছিমিছি মেরে ফেলে কী হবে?"

কুলদীপ বলল, "আপনি কী করে ওই বিষাক্ত সাপটাকে ধরলেন স্যর?"

মেজর কাঁধ নাচালেন, "এ আর কী। র‍্যাটল স্নেক ধরেছিলাম মরুভূমিতে গিয়ে। ভয়ঙ্কর র‍্যাটল স্নেক।"

অর্জুন এবার মালবাহকদের বুঝিয়ে দিল সুড়ঙ্গে কীভাবে চলতে হবে। মালপত্র মাথায় বা পিঠে নিয়ে যাওয়া চলবে না। দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হবে। অর্জুনের কথায় কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে নেওয়া হল। মেজরের পরামর্শে মশালগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল। অনেকটা সময় ধরে মালপত্রগুলো নিয়ে পর পর ওরা সেইখানে উপস্থিত হল যেখানে সাপটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাচ্চাগুলো আর নিচে পড়ে নেই। অর্জুন টর্চের আলো চারপাশে বুলিয়ে হঠাৎ উপরের একটা খাঁজের উপর ফেলতেই অবাক হল। কয়েকটা সাপ সেখানে ঝুলছিল। তারপরে লোমশ হাতগুলো বেরিয়ে এসে ওদের চোখের আড়ালে নিয়ে গেল।

অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, "হনুমান সাপের মাংস খায়?"

"এ দেশের হনুমান খায় কি না জানি না, আফ্রিকার বেবুনরা মাংস খেতে পছন্দ করে। হনুমান তো বেবুনের তুতো ভাই।" মেজর বললেন।

আরও খানিকটা সুড়ঙ্গের ভিতর ঘুরে ঘুরে একসময় দেখা গেল আর এগোন যাবে না। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে পাহাড়ের মধ্যে। মেজর বললেন, "মাই গড!"

অর্জুন কান পাতল পাহাড়ের দেওয়ালে। অনেকক্ষণ কান চেপে থাকার পর সে বলল, "একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কীসের আওয়াজ জানি না। কিন্তু শব্দ যখন শোনা যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে সামনের পাহাড় বেশি চওড়া নয়।"

এবার কুলদীপ কান রাখল। তারপর সে মালবাহকদের ডাকল। সবই মিলে হাত লাগিয়ে খুঁড়তে হবে পাহাড়ের দেওয়াল। তারও বিশ্বাস, এটা মোটেই বেশি চওড়া নয়। অর্জুন নিচের দিকে আলো ফেলে একটা ছোট গর্ত দেখতে পেল। অর্থাৎ সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে যে জল ঢোকে তা ওই গর্তের ভিতর চলে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। তাহলে যদি ওখান থেকে খোঁড়া শুরু করা হয় তাহলে কিছুটা সুবিধা হবে।

ঘণ্টা দু'য়েক চেষ্টার পর ওরা আচমকা আকাশ দেখতে পেল। সঙ্গে ছিল বাতাস। আলো প্রায় মরে এসেছে, কারণ আকাশ ভর্তি মেঘ। খানিকটা এগিয়ে যেতেই ওরা ঝরনার শব্দ স্পষ্ট শুনল। বেশ জোরে নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে। পনেরো ফুট চওড়া জলের ধারা। তীব্র স্রোত পাথরে শব্দ তুলছে যা সুড়ঙ্গের ভিতরে পাহাড়ে কান চেপে অর্জুন এবং কুলদীপ শুনতে পেয়েছিল। এই ঝরনা ধরে চললেই তিন ঝরনার সঙ্গমস্থলে পৌঁছনো যাবে।

কিন্তু অর্জুন ঘোষণা করল, আজকের মতো বিশ্রাম। শুনে মেজর খুশি হলেন, "আজ একটু বেশি খাটিয়েছ হে। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।"

তাঁবু খাটানো হল। মালবাহকেরা লেগে গেল রান্না করতে। ঝরনার জলে হাত দিয়ে মেজর বললেন, "উঃ, এই জল বোধহয় নর্থ পোল থেকে আসছে। কী ঠান্ডা!"

অর্জুন হেসে বলল, "আপনিও এই কথা বলছেন!"

মেজর উষ্ণ হলেন, "ঠাট্টা করছ। করো।"

সন্ধে হতে না হতেই ঠান্ডা বেড়ে যেতে লাগল হু হু করে। একই তাঁবুর মধ্যে মেজর, কুলদীপ এবং অর্জুন স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। একটু আগে তারা ডবল ডিমের ওমলেট আর গরম কফি খেয়েছে।

কুলদীপ বলল, "কাল রাতে এত ঠান্ডা পাইনি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কারণ ওই উঁচু পাহাড়টা আড়াল করে ছিল।"

মেজর পকেট থেকে তাঁর ধাতব পাত্র বের করে মুখ খুলে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢাললেন। "আঃ। স্বাদটাই পাল্টে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "ভাল না খারাপ?"

"খারাপ? দূর! অবশ্যই ভাল। তোমরা তো এই রসে বঞ্চিত, তাই ঠিক বুঝবে না। আচ্ছা, গ্রামের যে দু'জন মানুষ ফিরে গিয়েছিল একজনকে সাপ মেরে ফেলেছে বলে, সেটা কোন জায়গা থেকে?"

কুলদীপ বলল, "ওরা নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের খবর পায়নি। বোধহয় পাহাড় ডিঙিয়েছিল। স্টিফেন লিখেছেন, যে বৃদ্ধের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার বাবা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন। বোধহয় ওই পাহাড়টাই।"

অর্জুন বলল, "আমরা শেষপর্যন্ত ঝরনা পেয়েছি। নিশ্চয়ই আগামিকাল সঙ্গমে পৌঁছে যাব। সেখানে গেলেই ম্যাপের রাস্তা ধরতে পারব।"

মেজর বলল, "ওদের বলো তাড়াতাড়ি ডিনার খাওয়াতে। এই ঠান্ডায় জেগে থাকার দরকার নেই। ভোর ভোর উঠতে হবে।"

অর্জুন সোয়েটার পরেছিল। এবার মাথায় টুপি চাপিয়ে মাফলার গলায় জড়িয়ে একটি লাঠি নিয়ে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "একটা পাক দিয়ে আসি।"

"যাও।" মেজর বললেন, "কিন্তু লাঠির মুখ থেকে আমার সম্পত্তিটা খুলে দিয়ে যাও।"

অর্জুন হেসে ফেলল। রুমাল এবং পাইপ ফেরত দিয়ে বলল, "এগুলো ব্যবহার করার আগে ভাববেন সাপের ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে বিষও এর গায়ে লেগেছিল।"

মেজর রুমাল ফেলে দিয়ে পাইপটাকে বারংবার মোছার চেষ্টা করলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে নিজের রুকস্যাক থেকে ডেটলের শিশি বের করে পাইপের গায়ে তরল পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ইটস গুড।"

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসেই একটু কেঁপে গেল। তাঁবুর ভিতরের ঠান্ডার চেয়ে বাইরে অনেক বেশি। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারধারে। ঝরনার জলের শব্দ হচ্ছে কিন্তু জল দেখা যাচ্ছে না। ওপাশের তিনটি তাঁবুর দুটো থেকে আলো বেরিয়ে আসছে সামান্য। অর্জুন মালবাহকদের তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হল অন্ধকারে কিছু নড়ে উঠল। এতক্ষণ সে টর্চ জ্বালায়নি ইচ্ছে করেই। এবার টর্চ জ্বালতেই মনে হল অত্যন্ত দ্রুত কিছু লাফ দিয়ে গাছের আড়ালে চলে গেল। সে আর একটু এগিয়েও টর্চের আলোয় কাউকে ধরতে পারল না। এই প্রাণী হনুমান নয়। এর আকৃতি অনেক বড়। অন্ধকারে ওকে পরিষ্কার বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু মনে হচ্ছিল প্রাণীটি বেশ শক্তিশালী। মানুষের মতোই তার উচ্চতা। অন্ধকারে প্রাণীটির বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না তা বোঝা গেল। এই প্রাণী এই এলাকায় একা বাস করে তা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। আক্রান্ত হলে ওদের মোকাবিলা করার জন্যে কোনও অস্ত্র সঙ্গে নেই। বিদেশি রাষ্ট্রে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা খুব বিপজ্জনক। ধরা পড়লে বহু বছরের জেল হবেই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি থাকা দরকার।

অর্জুন মালবাহকদের তাঁবুর ভিতর ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "রান্নার কত দেরি?"

মালবাহকদের প্রধান বলল, "আর দশ মিনিট। আপনাদের জন্যে রুটি, আলুর তরকারি আর ডিমের তরকারি।"

"সেকী! একটু আগেই তো ওমলেট খাওয়ালে। যাক গে, তোমাদের হরিণের মাংস ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ সাহেব।"

"শোনো, দু'জন আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো। কম্বল জড়িয়ে এসো। খুব ঠান্ডা।"

দু'জন বাইরে এলে অর্জুন তাদের টর্চের আলোয় যতটা সম্ভব বেশি শুকনো খাদের ডাল, পাতা সংগ্রহ করতে বলল। চারধারে ওসব যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে ছিল। অর্জুন দুটো স্তূপ বানাতে বলল, একটা মালবাহকদের তাঁবুর সামনে, দ্বিতীয়টা তাদের তাঁবুর পাশে।

অর্জুন বলল, "খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে দুটো স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। মনে হয় ঘণ্টাখানেক জ্বলবে। আর তোমাদের চারজন পালা করে দুই ঘণ্টা করে জেগে থাকবে। আমরা একদম অজানা জায়গায় আছি, তাই সাবধান হওয়া উচিত।"

রাত্রের খাওয়া শেষ হলে মালবাহকেরা আগুন জ্বেলে দিল স্তূপে।

মেজর পাইপ ধরিয়ে বললেন, "তোমরা শুয়ে পড়ো। আমি প্রথম তিনঘণ্টা জেগে পাহারা দিচ্ছি। পাইপ খেলে আমার ঘুম আসে না।"

কুলদীপ জিজ্ঞাসা করল, "এই ঠান্ডায় কেউ হামলা করতে আসবে বলে মনে হয় না।"

অর্জুন ইতস্তত করল। সে যে প্রাণীটিকে দেখেছে তার কথা মালবাহকদের বলেনি কারণ ওরা ভয় পেয়ে যাবে। এখন এদের বলে কী লাভ হবে? যদি ওটাকে আবার দেখা যায় তখন না হয় বলা যাবে। সে বলল, "না কুলদীপ, সাবধানের কোনও মার নেই।"

মাঝরাতে কুলদীপ, ভোরের আগে অর্জুন জেগেছিল। রাতপাখির চিৎকার ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি।

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর যখন সূর্য দিগন্ত ছেড়ে কিছুটা আকাশে তখনই ওরা তিন ঝরনার মিলনস্থলে পৌঁছল। প্রচণ্ড বেগে দুটো জলের ধারা যেখানে আছড়ে পড়ছে সেখানে খুব শ্লথভঙ্গিতে তৃতীয় জলের ধারা মিশছে। প্রথম দুটোর তুলনায় তার শক্তি অনেক কম। মেজর বললেন, "এইখানে শরীর হালকা করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলে কেমন হয় অর্জুন?"

"এত তাড়াতাড়ি?" অর্জুনের প্রস্তাবটা পছন্দ হল না।

কুলদীপ বলল, "আমরা এখানে বসে আলোচনা করে নিতে পারি ম্যাপটাকে সামনে রেখে। তার মধ্যে খাওয়া হয়ে যেতে পারে।"

অতএব মালবাহকদের ব্রেকফাস্টের নির্দেশ দিল অর্জুন। তারপর তার পার্স থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করল। স্টিফেনের ম্যাপটার একটা কপি সে তৈরি করে এনেছিল, দ্বিতীয় কপিটা মেজরের হিপপকেটে আছে। মালপত্র খোয়া গেলেও যাতে ওটা না হারিয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা।

একটা বড় চওড়া পাথরের উপর ওরা বসল। সামনে তিনটে ঝরনার জল একত্রিত হয়ে নিচে বয়ে যাচ্ছে। অর্জুন দেখল দু'জন মালবাহক একটা চওড়া কাপড় নিয়ে জলে নেমে দুটো দিকে নিচে চেপে ধরে থাকল। কুলদীপ জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কী করছে?"

অর্জুন বলল, "বোধ হয় মাছ ধরতে চাইছে।"

ম্যাপ বের করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে চারপাশে নজর বোলাল তিনটে জলের ধারার পশ্চিমদিকে একটা বাইসনের মাথার মতো পাথর থাকা উচিত এখানে। সে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে তেমন কিছুই দেখতে পেল না। পাথর আছে বটে কিন্তু কোনওটাকেই বাইসনের মাথার মতো মনে হচ্ছে না। ম্যাপ বলছে ওই মাথার পিছন দিক দিয়ে কিছুদূর হাঁটলে জোড়া শালগাছ দেখা যাবে।

এই সময় মালবাহকদের উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল। দু'জন দু'দিক থেকে চওড়া এবং লম্বা কাপড়টাকে জলের উপর তুলে ধরেছে এবং তার মাঝখানে অনেকগুলো মাছ লাফাচ্ছে। দ্রুত পাড়ে উঠে এল ওরা। তারপর অর্জুনদের কাছে এসে মাছগুলো দেখাল। অর্জুন চিনল। এই মাছগুলোকে উত্তরবঙ্গে ঝিলা বলা হয়। তবে ঝিলার থেকে একটু বড়। একটা লোক গুনে বলল, "আঠারোটা মাছ।" মেজর খুশিমুখে বললেন, "দুপুরে জমিয়ে খাওয়া যাবে।"

মাছ নিয়ে ওরা সঙ্গীদের কাছে চলে গেলে সমস্যার কথা বলল অর্জুন। "এখানে একটা বড় পাথর থাকার কথা যেটা দেখতে বাইসনের মাথার মতো। কিন্তু সেরকম কিছু দেখছি না।"

মেজর তাঁর কপি বের করলেন। "কারেক্ট। তাহলে কি আমরা ভুল জায়গায় এসেছি!"

কুলদীপ মাথা নাড়ল, "এইরকম তিনটে ঝরনা এক হয়ে যাওয়া যখন পেয়ে গেছি তখন—!" সে পশ্চিমদিকে তাকাল, "চলুন, ওদিকে দেখে আসি।"

অর্জুন মেজরকে বলল, "আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা ঘুরে আসছি।"

শেষপর্যন্ত একটা পাথর পাওয়া গেল যার আকৃতি পশুর মাথার মতো দেখতে। কিন্তু সেটার চারপাশে গাছের পাতার আড়াল ছিল বলে চোখে পড়েনি অর্জুনের। যখন ম্যাপটা তৈরি হয়েছিল তখন এর চারপাশে গাছ গজায়নি। বহু বছরে সেটা হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাথরটার পিছন দিকে কোনও পথ নেই। কুলদীপকে ধন্যবাদ দিল অর্জুন। সে বলল, "আপনি এদিকে খুঁজতে এলে পেয়ে যেতেন। এ আর কী!"

প্রাতঃকৃত্য সেরে ওরা ভেবেছিল স্নান করে নেবে। কিন্তু জলে হাত দিয়ে বোঝা গেল শরীর ওই ঠান্ডা নিতে পারবে না। মেজর বেশ আফসোসের গলায় বললেন, "আজ এই ঠান্ডায় ঝরনার জলে স্নান করতে চাইছি না, অথচ, বুঝলে কুলদীপ, তিরিশ বছর আগে আলাস্কায় দিব্যি সাঁতার কেটেছি।"

কুলদীপ মোহিত হয়ে গেল। অর্জুন লক্ষ করছিল মেজর তাঁর অতীতের কীর্তির কথা কুলদীপের দিকে তাকিয়ে বলছেন।

ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা রওনা হল। বাইসনমুখো পাথরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মেজর চট করে তার গায়ে চকের দাগ আঁকলেন। বললেন, "মার্ক রাখলাম।" একটু একটু করে উপরে উঠতে হচ্ছে। ঝরনার শব্দ মিলিয়ে গেল। অর্জুন চোখ রাখছিল চারধারে। মেজর পিছন থেকে বললেন, "যমজ শালগাছ কখনও দেখেছ অর্জুন?"

"না।" অর্জুন বলল, "খুব ইন্টারেস্টিং।"

মালবাহকেরা গতি বাড়িয়ে ওদের ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল। মেজর বললেন, "ওদের বলো, দ্রুত হাঁটলেই আগে পৌঁছনো যায় না।"

অর্জুন কিছু বলল না। তার নজর তখন বিশাল গাছটার দিকে। সে ধীরে ধীরে জঙ্গল সরিয়ে গাছটার নিচে পৌঁছে চিৎকার করল, "পেয়েছি। পেয়েছি।"

দূর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই। মাটি থেকেই দুটো গাছ গায়ে গায়ে উপরে উঠে ডালপালা ছড়িয়েছে। প্রায় কুড়ি ফুট ওদের শরীর জোড়া। গাছটা শালগাছ।

মেজর বললেন, "ঈশ্বরের আজব সৃষ্টি।"

ম্যাপ বলছে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে। সেটা কতক্ষণের তা লেখা নেই। রেখাটা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পরে জঙ্গল শেষ হল। সামনে সামান্য উঁচু পাহাড়। অর্জুনের মনে হল উচ্চতা বড়জোর চারটে স্বাভাবিক মানুষের। পাহাড়টা বাঁ দিক থেকে ডানদিক আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিকেই কোনও পথ নেই।

অর্জুন বলল, "পাহাড়ে উঠতে হবে।"

মেজর বললেন, "নো প্রবলেম। কিন্তু ওরা অত মালপত্র নিয়ে উঠবে কী করে? অসম্ভব ব্যাপার। আমরা কতদূরে এসেছি?

"মাত্র কুড়ি ভাগ। এখনও আশি ভাগ বাকি।" অর্জুন বলল।

কুলদীপ মালবাহকদের সঙ্গে আলোচনা করার পর ওরা দড়ি দিয়ে মালপত্র বেঁধে নিল। তারপর সেগুলোকে পাহাড়ের নিচে রেখে দিয়ে খাঁজে খাঁজে পা ফেলে বেশ তরতরিয়ে উপরে উঠে গেল। তারপর দড়ির প্রান্ত ধরে চারজনে মিলে একে একে বোঝাগুলো উপরে টেনে তুলে নিল। মেজর বললেন, "বাঃ। বেশ বুদ্ধিমান দেখছি।"

অর্জুন বলল, "আপনি আগে উঠুন।"

"আমি আগে কেন? তোমরা যাও।" মেজর মাথা নাড়লেন।

"আমরা পিছনে থাকলে প্রয়োজন হলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব।"

"অ। ওদের বলো দড়িটা উপরে কিছুতে বেঁধে নিচে নামিয়ে দিতে। চিরকাল রোপ ক্লাইম্বিং করে এসেছি তো—!" মেজর রুকস্যাক খুললেন।

দড়ি ধরে মেজরের পাহাড়ে ওঠার দৃশ্য দেখতে দেখতে হাসি চাপল অর্জুন। কুলদীপ বলল, "যাই বলুন, এই বয়সে ওঁর এনার্জি অনেকের থেকে বেশি।"

পাহাড়ের উপর উঠে আবার হাঁটা শুরু হল। এবার পাকদণ্ডীর পথ। মেজর বললেন, "অদ্ভুত দেশ। কোনও মানুষ তো দেখা যাচ্ছে না, পাহারাতেও কেউ নেই।"

অর্জুন বলল, "ভাগ্যিস নেই, তাই আমরা সহজে যেতে পারছি।"

মেজর একবার লাঞ্চের কথা বলেছিলেন কিন্তু অর্জুন না শোনার ভান করে হেঁটেছিল। দুপুরে মাথার উপরে আওয়াজ শুরু হতেই মেজর বললেন, "হেলিকপ্টার বলে মনে হচ্ছে। এদিকে হেলিকপ্টার কেন?"

দ্রুত সবাইকে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে উবু হয়ে বসতে বলল অর্জুন। সবাই যখন জঙ্গলের আড়ালে তখন হেলিকপ্টারটাকে দেখা গেল। বেশ নিচ দিয়ে উড়ে এল ধীর গতিতে, মাথার কাছাকাছি এলে স্পষ্ট দেখতে পেল অর্জুন। একজন লোক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে চেয়ে আছে। তিনবার পাক খেয়ে বোধহয় একটু হতাশ বা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল হেলিকপ্টার। একসময় তার আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

মেজর বললেন, "মনে হচ্ছে ওরা কিছু খুঁজছে। কী খুঁজছে?"

অর্জুন বলল, "আমাদের কথা জানার কোনও সম্ভাবনা নেই। আর জানলেও কেন এসেছি, তা বুঝতে পারবে না। কোনও ভারতীয় ভুটানে এলে তাকে অস্ত্র হাতে নিশ্চয়ই খুঁজবে না ওরা। কিছু একটা হয়েছে।"

কুলদীপ বলল, "স্টিফেন সাহেব যাদের ভয়ে পালিয়ে নাথুয়াতে পৌঁছেছিলেন তারা সন্ধান পায়নি তো? তারাই হয়তো যা হোক কিছু বানিয়ে ভুটান সরকারকে বলেছে।"

"কল্পনা করে লাভ নেই। লক্ষ করুন হেলিকপ্টার এই পর্যন্ত এসে পাক খেয়ে ফিরে গেছে, আরও ওদিকে যায়নি। আমরা ওদিকে এগিয়ে যাই।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

বিকেলের একটু আগে একটা সরু ঝরনার পাশে ক্যাম্প খাটাল ওরা। ঝরনাটা পাহাড় থেকে নেমে আসছে। এখনও পর্যন্ত ম্যাপ অনুসরণ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। এরকম চললে কাল বিকেলেই গুহার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

মেজর হাঁকলেন, "জলদি জলদি ভাত আর মাছের ঝাল। তবে তার আগে একটা কফি চাই ভাই।"

কফি খেতে খেতে পাইপ ধরালেন মেজর। "এদিকে বন্যপ্রাণী নেই না কি!"

অর্জুন বলল, "না থাকাটা অস্বাভাবিক।"

"তাহলে তাদের দেখা পাচ্ছি না কেন?" মেজর ধোঁয়া ছাড়লেন।

কুলদীপ মালবাহকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে বলল, "ওরা খুব ভয় পেয়ে গেছে।"

অর্জুন সোয়েটারের উপর আর একটা জ্যাকেট চড়াচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

"ওদের একজন নাকি অদ্ভুত চেহারার কাউকে দেখেছে যার শরীর কালো লোমে ঢাকা। কিছু বোঝার আগেই সেটা এক লাফে উধাও হয়ে গিয়েছে।" কুলদীপ জানাল।

"কালো হনুমান?" মেজর জিজ্ঞাসা করল।

"লোকটা বলছে লম্বায় সেটা মানুষের মতন।"

"মানুষের মতন! এখানে তাহলে পাহাড়ি উপজাতির কিছু মানুষ আছে। খুব প্রাচীন উপজাতির একটা হবে। কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছে। সাধারণত এরা খুব ভীতু হয়। ওদের দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তা বুঝিয়ে বলেছ?" মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

"একটা কথা বলি।" অর্জুন বলল, "কাল রাতেও আমি ওরকম কিছু দেখেছি। দেখে ওদের আগুন জ্বালতে বলি। আর আগুন জ্বালার পর ওরা ক্যাম্পের দিকে আসেনি তা তো বোঝাই গিয়েছে। কিন্তু এখান থেকে গত রাতের ক্যাম্প আমাদের কাছে দূরের হলেও ওদের কাছে যে নয় তা আমার কাছে স্পষ্ট।"

"সে কী! তুমি তো কাল রাতে কিছু বলনি।" মেজর তাকালেন।

"আমি ভেবেছিলাম বোঝার ভুল।"

কুলদীপ বলল, "তাহলে ওরা গত রাত থেকে আমাদের ফলো করছে?"

"আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।" অর্জুন তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল।

চারধার চুপচাপ। এদিকে পাখিরাও বোধহয় আসতে পছন্দ করে না। গুঁড়ি মেরে অন্ধকার উঠে আসছে ওপাশের খাদের গহ্বর

থেকে। মালবাহকদের কাছে গিয়ে ভরসা দিল অর্জুন। তারপর সবাই মিলে শুকনো ডাল, মরা পাতার সঙ্গে মরা গাছের গুঁড়ি কেটে টুকরো করে তাঁবুগুলোর সামনে জড়ো করল। কালকের থেকে আজকের পরিমাণ অনেক বেশি।

তৃপ্তি করে খেল ওরা ঝিলা মাছের ঝাল আর ভাত। মেজর বললেন, "অসম্ভব ভাল স্বাদ। ইন্টারন্যাশনাল ফিস ফেস্টিভ্যালে নিয়ে গেলে আলোড়ন উঠত।"

কুলদীপ বলল, "চামুর্চির বাজারে প্রায়ই এই মাছ ওঠে, তবে সাইজে ছোট।"

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে আজ। সন্ধে নামতেই আগুনগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সেই আলোয় চারদিক যেমন আলোকিত হয়ে উঠেছে, তেমনই রাজ্যের পোকামাকড় ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার মধ্যে। কুলদীপ বলল, "ওই আগুনের পাশে স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে গিয়ে শুলে খুব আরাম হত।"

কথাটা বাকি দু'জন শুনেও কোনও মন্তব্য করল না।

ভোররাতে মালবাহকদের চিৎকার শুনে অর্জুন দ্রুত স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে এল। ভোরের পর্বে তারই জেগে থাকার কথা। বাকি দু'জন তখন গভীর ঘুমে। জ্যাকেট পরে টুপি মাথায় দিয়ে অর্জুন বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে টর্চ আর লাঠি হাতে নিয়ে। আলো নিভে গিয়েছে। মালবাহকেরা তাদের তাঁবুর ভিতর থেকে চিৎকার করে চলেছে। অর্জুন তাঁবুর বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই চিৎকার থামল। কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনজন বেরিয়ে এল বাইরে। টর্চের আলোয় ওদের দেখে অর্জুন বুঝতে পারল প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে ওরা। তিনজনে একসঙ্গে কথা বলছিল, তাদের অনেক চেষ্টায় শান্ত করে অর্জুন একজনকে কথা বলতে বলল। প্রধান যা বলল তা এইরকম—

ওদের দলের সবচেয়ে যে ছোট সে কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে বলে তার খুব পায়খানা পেয়েছে। একটা বড় মগে জল নিয়ে ওই ঠান্ডায় যখন সে তাঁবুর বাইরে চলে গেল তখন ওরা হাসাহাসি করল এই বলে গত রাতে ওই ছেলে সবচেয়ে বেশি ভাত খেয়েছিল। কিন্তু মিনিট দশেক পরেও যখন ছেলেটা ফিরে এল না, তখন ওরা চেঁচিয়ে নাম ধরে ডেকেছিল। কিন্তু সাড়া না পেয়ে ওরা টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে কোথাও দেখতে পায়নি। পায়খানার জন্য সে নিশ্চয়ই বহুদূরে যাবে না। তাই ওরা খুব ভয় পাচ্ছে ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে।

তখনও ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে। চিৎকার শুনে কুলদীপও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। টর্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল ওরা। প্রায় একশো গজ দূরে একটা বুনো ঝোপের গায়ে লাল কম্বল দেখে কাঁদতে লাগল মালবাহকেরা। ওই কম্বল ছেলেটির।

আলো ফুটল।

মালবাহকদের প্রধান জানিয়ে দিল তাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে না পেলে ওরা আর এক পা-ও এগোবে না। এখানে আর একটা দিন অপেক্ষা করে ওরা ফিরে যাবে। কুলদীপ অনেক বোঝাল কিন্তু কাজ হল না।

মেজর অনেকক্ষণ ধরে খালি পেটে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ সকালে মালবাহকদের চা তৈরি করে দেওয়ার কথাও বলা যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত তিনি মুখ খুললেন, "অর্জুন, তুমি তো জেগে ছিলে, কোনও জন্তুর আওয়াজ কি পেয়েছিলে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। নিঃশব্দে নিয়ে গিয়েছে লোকটাকে।"

"কে নিল?" মেজর হঠাৎ খেপে গেলেন, "আই মাস্ট কিল হিম। কে নিল?"

ওরা সকলে বের হল। ঘণ্টা তিনেক তল্লাশি করেও কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ে গেল। সে সবাইকে এক জায়গায় করে যে যেমন পারে থালাবাসন নিয়ে চিৎকার এবং আওয়াজ করতে বলল। মেজর রেগে গেলেন, "হোয়াট ননসেন্স। আওয়াজ করলে লোকটাকে ফেরত পাওয়া যাবে?"

"এমনিতেই তো পাওয়া যাচ্ছে না, করে দেখুন না।" অর্জুন বলল। চিৎকার এবং আওয়াজ পাশের পাহাড়ের দিকে মুখ করে শুরু হল। মিনিট দুয়েক পরে পাহাড়ের নিচের দিকের গাছগুলো নড়তে লাগল। তারপর মনে হল কয়েকজন হুটোপুটি করে আরও উপরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

মেজর অবাক হয়ে বললেন, "মাই গড! ওগুলো কী?"

অর্জুন সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল সমান শব্দ এবং চিৎকার করতে করতে। যত তারা উপরে উঠছিল তত লক্ষ করছিল আর কোনও গাছের পাতা নড়ছে না। যারা পালিয়েছে তাদের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ।

মিনিট দশেক পাহাড়ে ওঠার পর একজন মালবাহক চেঁচিয়ে উঠে দ্রুত একটা বড় পাথরের দিকে চলে যেতেই সবাই তাকে অনুসরণ করল।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। দুটো হাত দু'দিকে ছড়ানো। ওকে নাম ধরে ডাকছিল মালবাহকেরা, মেজর হাঁটুমুড়ে পাশে বসে নাড়ি দেখলেন, গলার উপরে আঙুল চেপে ধরলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "ওকে সাবধানে ক্যাম্পে নিয়ে চলো।"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "কী অবস্থা?"

"এখনও বেঁচে আছে। কুইক।" মেজর চিৎকার করলেন।

অদ্ভুত ব্যাপার, ছেলেটির শরীরে কোনও ক্ষত নেই, রক্ত ঝরছে না। শ্বাস পড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই। মালবাহকেরা ওর মুখে মাথায় ভেজা গামছা বুলিয়ে দিচ্ছিল। এই সময় ওদের একজন তিনকাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এল থালায় করে। মেজর বললেন, "আহা, এখন আবার চা কেন?" বলে কাপ তুলে নিলেন।

ছেলেটার জ্ঞান ফিরল এগারোটা নাগাদ। নিষেধ করা সত্ত্বেও সে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড শক্ পেয়েছে সে। কথা বলতে চেষ্টা করে কাঁপছিল। মেজর তাঁর রুকস্যাক থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে এনে ওকে খাইয়ে দিতে বললেন। ঘণ্টা তিনেক ঘুমোতে পারবে এবং ওষুধের কল্যাণে ওর শরীর স্থিতিশীল হবে।

ওকে এই অবস্থায় যেমন নিয়ে যাওয়া যায় না, তেমনই একা ফেলে রাখাও সম্ভব নয়। কুলদীপ এবং মেজরের সঙ্গে আলোচনায় বসল অর্জুন।

কুলদীপ বলল, "আপনার কি বিশ্বাস ওই লোমশ প্রাণীগুলো ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল? কিন্তু কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে ওর শারীরিক ক্ষতি করেনি!"

অর্জুন বলল, "অন্য কোনও হিংস্র প্রাণী হলে শরীর অক্ষত থাকত না। এতক্ষণে অর্ধেকটাই খেয়ে ফেলত। এই লোমশ প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই মাংসাশী নয়।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ অর্জুন, কুলদীপ খবর এনেছিল ওই গ্রাম থেকে যে ওদের দু'জনকে ওই ধরনের প্রাণী তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি যখন তখন কেন ধরে নেওয়া হবে ওরাই দু'জনকে ভক্ষণ করেছে? আবার যে মাংসাশী নয় তাও প্রমাণিত হচ্ছে না। তবে ওদের সঙ্গে এদের পার্থক্য থাকতে পারে।" মেজর পাইপ ধরালেন।

"একটা পার্থক্য স্পষ্ট। গ্রামে যারা এসেছিল তারা জঙ্গলের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে এসেছিল। আর গতরাতে এরা এসেছিল নিঃশব্দে।" অর্জুন বলল।

"এরা মানে কতজন?" মেজর তাকালেন।

"সেটা বলব কী করে! কেউ তো দেখিনি।" অর্জুন বলল, "আমার মনে হচ্ছে এই জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। অথচ পরিস্থিতি যা—।"

"ওর সুস্থ হয়ে উঠতে আরও দুটো দিন লাগবে।" মেজর বললেন, "অবশ্য যদি মন থেকে ভয়টা দূর হয়ে যায়।"

"আরও দুটো দিন এখানে অপেক্ষা করব আমরা?" কুলদীপ

কথা বলল, "ওরা এখানেই থাকুক। আমরা যদি এগিয়ে গিয়ে পথটা ভাল করে দেখে নিই।"

"দেখে কি আবার ফিরে এখানে আসবেন রাত কাটাতে?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "সেটা সম্ভব নয়। ছেলেটার সঙ্গে ওদের প্রধান এখানে থেকে যাক। বাকি দু'জন যতটা পারে ততটাই মালপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুক। কুলদীপ ওদের বুঝিয়ে বলুন।"

কুলদীপ গেল কথা বলতে। মেজর বললেন, "দুপুর হয়ে গেল। আমাদের টিন ফুডের স্টক থেকে কয়েকটা বের করে নিয়ে এসো। লাঞ্চটা করে ফেলি।"

মালবাহকদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কথা বলার পর কুলদীপ ফিরে এল গম্ভীর মুখে। বলল, "দাদা, প্রথমে ওরা আর এগিয়ে যেতে চাইছিল না। ছেলেটা সুস্থ হলেই ফিরে যাবে বলছিল। অনেক বোঝানোর পর দু'জন রাজি হল যেতে, ছেলেটার সঙ্গে তৃতীয়জন এখানে থেকে যাবে। কিন্তু একটা শর্তে।"

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "এক্সট্রা টাকা চাইছে?"

"না। বলছে ওই দু'জনের সঙ্গে আমাদের একজনকে থাকতে হবে নইলে ওরা ভরসা পাবে না। কী করা যায় বলুন।"

মেজর বললেন, "দরকার নেই, আমরা তিনজনেই এগিয়ে যাই। ম্যাপ বলছে এখান থেকে মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর যে পাহাড়টায় কোনও গাছ নেই সেখানেই গুহাটা রয়েছে। তাহলে ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে রাত কাটিয়ে ভোরে আমরা গুহার খোঁজে যেতে পারি। নো প্রবলেম।"

"রাতটা কাটাবেন কোথায়? তাঁবুর বাইরে স্লিপিং ব্যাগে শুলেও আর সকালে উঠতে পারবেন না। তাছাড়া গুহাটাকে যে একদিনেই খুঁজে পাব তারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওদের সাহায্য অবশ্যই দরকার।" অর্জুন বলল।

কুলদীপ বলল, "আমি বলছি, আপনারা এগিয়ে যান। আমি ওই দু'জনের সঙ্গে থাকি। যে দু'জন যাবে তারা শুধু তাঁবু, খাবার আর সামান্য সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে?"

মনঃপুত হচ্ছিল না অর্জুনের। কুলদীপ সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধা হত। কিন্তু মেজরকে তো বলা যাচ্ছে না, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

অর্জুনের ভাবনা অনুমান করে কুলদীপ বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না দাদা। আমি ওদের রাজি করিয়ে কালই আপনাদের কাছে চলে আসতে পারি।"

"তাহলে খুব ভাল হয় কুলদীপ। কিন্তু এখানে তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওরা এবার আক্রমণ করতে পারে। যত পারো শুকনো কাঠ, পাতা, ডাল জোগাড় করে তাঁবুর চারপাশে রাখো যাতে আগুনটা সারারাত জ্বলে। ওরা আগুন নিভে না গেলে এদিকে আসবে না।" অর্জুন বলল।

"চিন্তা করবেন না। এবার এলে ওদের লাশ দেখতে পাবেন ফেরার পথে।" কুলদীপ চলে গেল ব্যবস্থা করতে।

মেজর বললেন, "ছেলেটি বেশ ভাল।"

কুলদীপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হল। যে দু'জন মালবাহক সঙ্গে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বাধ্য হয়ে তারা হাঁটছে। একটু একটু করে পাহাড়ে উঠছিল ওরা এঁকে বেঁকে। কোনও পথ নেই। অর্জুন মাঝে মাঝে ম্যাপে চোখ বোলাচ্ছিল। ক্রমশ গভীর হচ্ছিল জঙ্গল। আচমকা একদঙ্গল হনুমান তাদের দেখে চিৎকার শুরু করে দিল। গাছের ডাল ভেঙে একজন ওদের দিকে ছুড়ে মারতেই মেজর তার উদ্দেশে গালাগাল শুরু করলেন গলা ফাটিয়ে। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত একটি শব্দও অর্জুন বুঝতে পারছিল না। তিনি থামলে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "কী ভাষায় ওদের বকলেন?"

"পুলু। এই ভাষাটা পৃথিবীর সব হনুমান বোঝে।" গম্ভীর গলায় বললেন মেজর। অর্জুন কথা বাড়াল না।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর মেজর ঘোষণা করলেন তিনি আচমকা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অর্জুন মেনে নিল। আলো ফুরোতে বেশি দেরি নেই। তার উপর জোর হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় কনকনে ঠান্ডা। পাহাড়ের গায়ে তাঁবু ফেলা হল যাতে হাওয়াটাকে আটকানো যায়। আজ তাঁবুর সংখ্যা দুটো। ওপাশে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে আসা জলের ধারা থাকায় মালবাহক দু'জনের সুবিধা হল রান্না শুরু করতে। অর্জুন একটু খুঁজতেই মরা গাছ পেয়ে গেল। হয়তো ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে। পাতা ঝরে গেছে। দু'জন মালবাহকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই গাছ কেটে টুকরো করতে করতে অন্ধকার নামল। যে পরিমাণ কাঠ আনল, তা সারারাত ধরে জ্বলবে। ভাত ডাল আর টিনফিস খেয়ে মেজর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পাইপ ধরালেন। "যতদূর বুঝছি, আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি। বাকি তিন কিলোমিটার কাল দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব। তারপর লাঞ্চ।"

অর্জুন বলল, "আমার মনে হয় লাঞ্চের জন্য না থেমে কালই গুহার সন্ধানে গেলে ভাল হয়। খুঁজতেও তো সময় লাগবে।"

"ম্যাপে দেখেছ? তিনপাহাড়ের বুক চিরে এগিয়ে যেতে হবে। লাইনটা শেষ হয়েছে দাঁড়ানো মমির মতো পাথরে। ঠিক আছে, ওই তিনপাহাড়েই ক্যাম্প করা যাবে। পরের ভোরে গুহাতে পা ফেলব। ওয়েল, অর্জুন, তুমি কী এক্সপেক্ট করছ?"

"কী ব্যাপারে?"

"উঃ।" মেজর বিরক্ত হলেন, "ওই গুহার ভিতরে গিয়ে কী দেখবে?"

"সেটা গিয়েই দেখতে পাব। আমি কিছু ভাবছি না।"

"কিন্তু ওই স্টিফেন ব্যাটা লিখে গেছে ওখানে সবসময় প্রেতাত্মারা পাহারা দিচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু যার একটা পেলেই রাজা হওয়া যায়। আমি অবশ্যই প্রেত-ফ্রেতে বিশ্বাস করি না। ওসব ভয় দেখানোর জন্যে। কিন্তু ওই রত্নের খনি গুহাতে কে রাখল? নিশ্চয়ই তিনি আর একজন কিং সলোমন?"

"ভুটানে মুসলমানরা কখনওই রাজত্ব করেনি। যিনি রেখেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই একজন ভুটানি। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ভদ্রলোক এরকম দুর্গম জায়গায় একটা গুহার মধ্যে ধনরত্ন রাখতে যাবেন কেন?" অর্জুন বলল।

"তার মানে তুমি ওখানে কিছু আশা করছ না?"

"আপনাকে তো বললাম, গেলেই দেখা যাবে।"

"আশ্চর্য! তাহলে এত কষ্ট করে এলে কেন?"

"একটা রূপকথার খোঁজে। স্টিফেন সাহেব বলেছেন, আরও কেউ কেউ এই গুহার সন্ধান করছে। নাথুয়াতে স্যারের বাড়িতে তারাই বোধহয় হামলা করেছিল। আমি জানি না হেলিকপ্টারে তল্লাশি তারাই চালিয়েছে কি না। যারাই ওসব করুক, তাদের ধারণা গুহার ভেতর অমূল্য সম্পদ লুকানো আছে। যদি কিছু না থাকে তাহলে ফিরে গিয়ে সে কথা বললে অনেকেই আর লোভের ফাঁদে পড়বে না। সেটাও একটা লাভ। আর আপনি ফিরে গিয়ে নিউ ইয়র্কের একটা ভ্রমণ পত্রিকায় এ সব কথা লেখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আপনার তো ফটো তোলার কথা ছিল। তুলছেন না তো?" অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

"তুমি আমার টুপিটাকে ভাল করে দ্যাখোনি।" আঙুল তুলে কপালের উপরে টুপির সামনের গোল বৃত্তটাকে দেখালেন মেজর, "এটা শুধু ডিজাইন নয়। মাঝখানে ক্যামেরার লেন্স আছে। টুপির ভিতরে মিনি ক্যামেরা। এর মধ্যে গোটা দশেক রোল ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিক্রেট ক্যামেরা। হা হা হা।"

রাতটা নির্বিঘ্নে কাটল। প্রথম রাত জেগেছিলেন মেজর। সাড়ে বারোটা নাগাদ অর্জুনকে ডেকে তুলে চোখ বুজেছিলেন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'ফিং কিসকুস।"

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মানে কী?"

"পৃথিবীর ভাল হোক। এস্কিমোদের প্রাচীন শব্দ।" মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

ডবল ডিমের ওমলেট আর চা খেয়ে আবার হাঁটা শুরু। অনেকটা চড়াই ভাঙার পর উৎরাইও কম নয়। ক্রমশ গাছ বা বুনো ঝোপ শেষ হয়ে ন্যাড়া পাথর আর শুকনো পাহাড়ে চলে এল ওরা। দুপুর দুটো নাগাদ সেই তিনপাহাড়ের চুড়ো দেখতে পাওয়া গেল। সেই পাহাড়ের গায়ে পৌঁছতেই সাড়ে তিনটে বাজল। তখনই দূরের আকাশে আওয়াজ উঠল। অর্জুন সবাইকে নিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে এল। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "কী মনে হচ্ছে।"

এই রুটে যদি নিয়মিত দেখা যেত তা হলে অনেকবার তাদের দেখতে পেতাম। নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার বলতে না বলতেই চক্কর মারতে দেখা গেল হেলিকপ্টারকে। তারপর নিচু হয়ে খানিকটা উড়ে আবার ফিরে গেল সেটা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অর্জুন বলল, "নাঃ, আজ রাতে এখানেই ক্যাম্প করা যাক।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। কানে যেন মধু দিলে আমার।"

এবারও পাহাড়ের খাঁজ ঘেঁষে তাঁবু ফেলা হল। মুশকিলে পড়ল অর্জুন। কাছাকাছি কোথাও গাছ দূরের কথা, বুনো ঝোপও নেই যে তা জড়ো করে আগুন জ্বালাবে। সে গম্ভীর গলায় বলল, "আজকের রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।"

"কারণ কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। চারধার শুনশান, কোনও প্রাণী নেই, এমনকী পাখিও। ওই লোমওয়ালা জন্তুগুলো নিশ্চয়ই এতদূরে চলে আসে না। একমাত্র মানুষ আর পাখি ছাড়া কেউ নিজেদের এলাকার বাইরে যায় না। ঠান্ডা বাড়ছে খুব, ব্যাগের ভিতর আরামসে ঘুমিয়ে পড়ো।" মেজর পকেট থেকে তরল পদার্থের ধাতব শিশি বের করে খানিকটা গলায় ঢাললেন, "আঃ। আরাম হল। খাবে নাকি?"

মাথা নাড়ল অর্জুন। না। সে মেজরের সঙ্গে একমত হচ্ছিল না।

সঙ্গে যা যা শীতবস্ত্র এনেছিল তার সবক'টা শরীরে চাপানো সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল হাড়ের ভিতর ঠান্ডা ঢুকছে। জড়তা কাটাতে সে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াতেই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখতে পেল। পশ্চিম আকাশে যেন রঙের হোলি খেলা চলছে। সোনালি আলোর সঙ্গে রুপো মিশে স্বপ্নের চেয়ে অভাবনীয় একটি ছবি তৈরি হচ্ছে, ভাঙছে, আবার অন্য ছবি হয়ে যাচ্ছে। তীব্র ঠান্ডা বাতাস সত্ত্বেও অর্জুনের মনে হচ্ছিল, এখানে এসে ধন্য হয়ে গেল।

সন্ধের মুখেই রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গেল। অর্জুন মালবাহক দু'জনকে বলল, "কোনও অবস্থাতেই তাঁবুর বাইরে যাবে না। আজ আমরা আগুন জ্বালতে পারছি না তাই আরও সাবধানে থাকতে হবে সবাইকে। কাল তোমাদের ছুটি। তাই আজ বেশি না ঘুমালেও চলবে।"

ঘণ্টাখানেক পরে হাওয়ার তেজ আরও বাড়লে মালবাহকদের চিৎকার কানে এল। অর্জুন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?" সে তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়াল।

মালবাহকেরা তাঁবুর সামনে এসে কাতর গলায় বলল ওই তাঁবুতেও তাদের ভয় করছে। মনে হচ্ছে তাঁবুর দড়ি যে কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়বে। আজকের রাতটা যদি অর্জুনদের তাঁবুর এককোণে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে ওরা খুশি হবে। অর্জুন তাঁবুর ভিতরে তাকাল। দু'জনের পক্ষে তাঁবুটা ঠিকঠাক কিন্তু আরও বাকি দু'জন ঢুকলে নড়াচড়ায় অসুবিধা হবে। কিন্তু না বলতে পারল না অর্জুন।

ওরা ভিতরে ঢুকে পড়ল কয়েকটা কম্বল নিয়ে। তাঁবুর কোণে প্রায় গুটিসুটি মেরে ওগুলো জড়িয়ে বসে পড়ল। মেজর চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। তাঁবুর ভিতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। অর্জুন তাঁবুর ঢোকার জায়গা ভাল করে বন্ধ করল। তারপর নিজের স্লিপিং ব্যাগে ফিরে গিয়ে মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, "আলো নিভিয়ে দেব?"

"পাগল। অন্ধকারে ওদের শরীরে পা ফেলে দিতে বলছ?" মেজর বললেন।

"ওরা খুব ভয় পেয়েছে।"

"ঠিক আছে। ওদের জিজ্ঞাসা করো ড্রিঙ্ক করবে কি না। দু'ঢোক দিতে পারি।" মেজর বলামাত্র অদ্ভুত একটা আওয়াজ কানে এল। যেন অনেকগুলো শঙ্খ একসঙ্গে বাজছে। মেজর উঠে বসলেন, "হোয়াটস দ্যাট?"

"বুঝতে পারছি না"। প্রাকৃতিক কোনও শব্দ নয়। কিন্তু এখানে মানুষ কোথায়?"

"অর্জুন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, স্টিফেন লিখেছে ওই গুহা যে সব প্রেতাত্মা পাহারা দেয় তারা বিধর্মীদের অপছন্দ করে। তুমি বা আমি বৌদ্ধ নই। আমরা যে এখানে এসেছি তা—।" মেজর আচমকা থেমে গেলেন। আওয়াজটা বেশ জোরে শোনা গেল। সেটা থামতেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি ভাবছেন ওই আওয়াজটা প্রেতাত্মারা করছে? তাহলে তো তারা আছে। তাই না?"

"না, আমি সে কথা বলছি না। আমি এখনও প্রেতাত্মা আছে বলে মানি না। কিন্তু আর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।" মেজর বললেন।

"চলুন, দেখে আসি।" অর্জুন সোজা হল।

"ওকে। আমি রাজি আছি।" কিন্তু মেজর কথাগুলো বলামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। টপটপ আওয়াজ হচ্ছে তাঁবুর উপরে। হাওয়ায় তাঁবু কাঁপতে শুরু করায় হ্যারিকেনের আলো দুলছে। মেজর দ্রুত দু'ঢোক তরল পদার্থ গলায় ঢাললেন। আর তখনই বৃষ্টির শক্তি বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে কাছাকাছি সশব্দে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ যে চমকাচ্ছে তা তাঁবুর আড়াল সত্ত্বেও ওরা টের পাচ্ছিল।

অর্জুন তাঁবুর উপরের দিকে তাকাল। জল আছড়ে পড়ছে তাঁবুর গায়ে। মাঝে মাঝে জোরালো বাতাসের চাপে তাঁবুর দড়ি মচমচ করছে। যদি ছিঁড়ে যায় তাঁবু উড়ে যাবে। এই ঠান্ডায় জলে ভিজলে মৃত্যু অনিবার্য। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "ছিঁড়বে না তো! ওহে, তুমলোগ ঠিক সে বাঁধা হ্যায় তো?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "ঠিক করেই বেঁধেছে, ছিঁড়লে কিছু করার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল খুব কাছে। মেজর বললেন, "ওটা এই তাঁবুর উপর পড়লেই আমরা এতক্ষণে ছাই হয়ে যেতাম। সেই ছাই-এর উপর বৃষ্টির জল পড়লে গলে গড়িয়ে যেতাম খাদে। কেউ হাজার খুঁজলেও ট্রেস পেত না।"

অর্জুন মেজরের কথায় কান দিচ্ছিল না। মাঝে মাঝে হাওয়ার জোর এমন বাড়ছিল যে মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে দড়ি না ছিঁড়ে যাক, তাঁবুটাই ফেটে যাবে। মালবাহকদের দিকে তাকাল। অতি অল্প জায়গা নিয়ে ওরা দু'জন কম্বলে মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে ওরা এইভাবে ঝুঁকি নেয়। বাঁচার জন্যে মানুষকে কত কষ্ট করতে হয়।

শেষপর্যন্ত তাঁবুর উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল ভিতরে। ওরা স্লিপিং ব্যাগ জায়গাটা থেকে সরিয়ে নিল। হঠাৎ পাহাড়টা বেশ কেঁপে উঠল বলে মনে হল। সেইসঙ্গে ঝড় উত্তাল হতেই হ্যারিকেনের আলো দপ করে নিভে গিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার তাঁবুর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

মেজর চিৎকার করলেন, "হোয়াট ননসেন্স।"

অর্জুন চাপা গলায় বলল, "প্রবাদ আছে, সর্বনাশ একা আসে না।"

"আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অর্জুন।" মেজর চেঁচালেন।

"শুনতে পাচ্ছি। আস্তে বলুন।"

"অ। অন্ধকারে স্কেলটা চড়া হয়ে গিয়েছিল। এখন কী করবে?"

"কিছুই করার নেই। এই বৃষ্টিতে বাইরে বের হলে এখান থেকে ফেরা হবে না।"

"দ্যাটস রাইট।" মেজর যেন মিইয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে মেজর আবার মুখ খুললেন, "যদিও আমি একদম বিশ্বাস করি না কিন্তু এ কথা তো সত্যি আমরা বৌদ্ধ নই।"

"তাতো ঠিক।" অর্জুন অন্ধকারেই মেজরের দিকে মুখ ফেরাল।

"না। স্টিফেন লিখেছে যে ওই গুহায় যেসব প্রেতাত্মা পাহারা দিচ্ছে তারা বিধর্মীদের সহ্য করতে পারে না। তাই তো?"

"ঠিক।"

"তা তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই স্টিফেন ঠিক লিখেছে, তাহলে ওই সব প্রেতাত্মারা কি শুধু গুহার ভিতর আটকে থাকে না কি বাইরে এসে এই পাহাড়টাকেও পাহারা দেয়?"

"সে কথা অবশ্য স্টিফেন সাহেব লিখে জানাননি।" অর্জুন হাসল, "আপনার কি মনে হচ্ছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ওই প্রেতাত্মারাই করাচ্ছে?"

"আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। কিন্তু যদি স্টিফেন এই সময় আমাদের সঙ্গে থাকত, তাহলে সে ওই কথাই বলত।" মেজর শ্বাস ফেললেন।

কিন্তু চমৎকার একটা ভোর এল কয়েকঘণ্টা পরে। এক ফোঁটাও মেঘ নেই আকাশে। সোনালি রোদে সুন্দর দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে। চা-জলখাবার খেয়ে মালবাহকদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে অর্জুন মেজরকে নিয়ে রওনা হল তিনপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, ম্যাপের নির্দেশমতো। পিঠের রুকস্যাকে নিয়ে নিল জল, টিনফুড আর দুটো ছোট ছোট মশাল। হাতে লাঠি। টর্চ।

এদিকে শুধু পাথর ছড়ানো। তাদের আকৃতিও বেশ বড়। একটা পাথরের উপর ওঠার পর নামার জায়গা খুঁজে নিয়ে পরের পাথরের উপরে উঠতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ ওই কসরত করার পরে মেজর কাহিল হয়ে পড়লেন। অর্জুন বলল, "একটু জিরিয়ে নিন।"

"আমি অবশ্য জিরোবার পক্ষপাতী নই, কিন্তু শরীরটা বিট্রে করছে আজ।" মেজর পাথরের উপর বসে পাইপ ধরালে অর্জুন বলল, "ওটা এই সময় খাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? আরও বেদম হয়ে পড়বেন।"

প্রতিবাদ করতে গিয়েও করলেন না মেজর। পাইপের আগুন নেভালেন।

অর্জুন খুশি হল। বলল, "ম্যাপ কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে গেছে।"

"অর্থাৎ যে ওটা তৈরি করেছিল, সে এরপরে আর যায়নি। কেন?"

"বুঝতে পারছি না। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।"

"কিন্তু আমরা গুহাটাকে খুঁজে বের করব কী করে?"

"ওই পাহাড় অবধি চলুন। যতগুলো গুহা আছে, সবগুলোতেই ঢুঁ মেরে দেখব। কিন্তু এখনই অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। বিকেলের মধ্যে ফিরতে হবে আমাদের। আবার যদি ঝড়বৃষ্টি হয়—!" অর্জুন বলল।

"ঝড়ের কথা বাদ দাও। অন্ধকারে তো এই পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না।" মেজর বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

দুপুর বারোটা নাগাদ ওরা পাহাড়ের নিচে পৌঁছতে পারল।

বোতলের জল গলায় ঢাললেন মেজর। সেটা অর্জুনের হাতে দিয়ে বললেন, "এবার!"

"আপনি বাঁ-দিকে যান, আমি ডানদিকে। গুহার মতো কিছু দেখতে পেলে চেঁচিয়ে ডাকবেন।" অর্জুন ডানদিকের পাথর টপকে হাঁটতে লাগল।

মিনিট পনেরো পরে তার মনে হল মেজর চিৎকার করছেন। সে দুটো হাত মুখের দু'পাশে নিয়ে এসে যতটা সম্ভব জোরে জানান দিল। তারপর মেজরকে খোঁজার জন্য এগিয়ে গেল। পাহাড়টার যে জায়গাটা ইংরেজি ইউ-এর মতো হয়ে রয়েছে তার সামনের পাথরে মেজর বসেছিলেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, "পণ্ডশ্রম। নো গুহা। এদিকে কোনও গুহাই নেই।"

"ওঃ। আপনার গলা পেয়ে ভেবেছিলাম একটা কিছু খুঁজে পেয়েছেন।" অর্জুন বলল।

মেজর হাসলেন। "গুহা না পাই আর একটা জিনিস পেয়েছি। ওই ওদিকে তাকিয়ে দেখো।"

মেজরের আঙুল লক্ষ্য করে অর্জুন দেখল পাথরের পাশে একটা বড়সড় খয়েরি রঙের খরগোশ পড়ে রয়েছে।

মেজর বললেন, "বোধ হয় চোখে দেখতে পেত না।"

"মানে?"

"পাথরের উপর বসেছিল। আমায় দেখেও পালাচ্ছে না দেখে আমি একটা বড় পাথর তুলে মারতেই মরে পড়ে গেল। একসময় আমার হাতের টিপ দুর্দান্ত ছিল। বুঝলে? যাক গে, ঝলসে নিলে চমৎকার লাঞ্চ হয়ে যাবে।" মেজরের কথা শুনতে শুনতে পাহাড়ের ইউ আকৃতির দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট হয়ে গেল অর্জুনের। নিচের দিকে যেন একটা গর্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একটা মাঝারি আকৃতির পাথর সামনে থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মেজর দেখলেন অর্জুন খরগোশের দিকে না গিয়ে পাহাড়ের খাঁজের দিকে যাচ্ছে। তিনি গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওদিকে যাচ্ছ কেন?" অর্জুন হাত তুলল, মুখে কিছু বলল না।

হ্যাঁ, পাথরের আড়ালে ওটা গর্তই। হাতের লাঠি ভেতরে ঢোকাল অর্জুন। পাথরে লাঠির ডগা বাধা পেলেও ভেতরে ঢুকছে। অর্জুন শুয়ে পড়ল। তারপর হাত এবং লাঠির সাহায্যে ছোট ছোট পাথর সরিয়ে ধীরে ধীরে শরীরটাকে ভিতরে নিয়ে যেতে লাগল। সামনে গভীর অন্ধকার কিন্তু আর পাথরের বাধা নেই। পিছন থেকে মেজরের গলা ভেসে এল, "এ তো মাটির উপর সাঁতরে যেতে হচ্ছে হে।"

প্রায় আধঘণ্টা শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পর ঝাপসা আলো চোখে পড়ল। একটু বাঁক ঘুরতেই দেখল গর্তটা বড় হয়েছে। উবু হওয়া যায়। সেইভাবে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখল জায়গাটার মাথার উপর পাহাড়ের আড়াল নেই। সূর্যের আলো বেঁকেচুরেই যেন চলে এসেছে সেখানে। একটা টেনিস কোর্টের মতো জায়গাটার চারধারে ভাল করে দেখল অর্জুন। তখনই বাদুড়জাতীয় পাখিগুলোকে পাথরের আড়ালে ঝুলতে দেখতে পেল। ওখানে আলো পড়েনি, ছায়ায় মাখামাখি। ততক্ষণে মেজর এসে দাঁড়িয়েছেন, "অন্তত আটত্রিশ জায়গায় হয় ছড়ে গিয়েছে, নয় কেটেছে। তা যাক। জায়গাটা তো বেশ রহস্যময় হে।"

অর্জুন এগিয়ে গেল যেদিকে বাদুড়গুলো ঝুলছিল। তাকে দেখেই বোধহয় একটা বড় পাথরের উপর দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা। অর্জুন দেখল পাহাড় আর পাথরের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক আছে। সে মেজরকে বলল, "শরীরে যত জোর আছে এক করে পাথরটাকে সরাতে হবে। আসুন।"

"ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টি ফোর আমি ইউএসএ-র ওয়েট লিফটার হিসাবে ওলিম্পিকে সিলেক্টেড হয়েছিলাম। পেট খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে পার্টিসিপেট করতে পারিনি। সেসময় যদি বলতে তাহলে একাই সরিয়ে দিতাম পাথরটাকে। ওকে। হাত লাগাও। ওয়ান, টু, থ্রি—।"

দু'জনের মিলিত শক্তিতে পাথরটা ঈষৎ নড়ল মাত্র। মেজর চেঁচালেন, "একবারে না পারিলে ঠ্যালো শতবার।"

মিনিট দশেকের চেষ্টায় পাথরটাকে নিচে গড়িয়ে ফেলা গেল। আর তখনই সুড়ঙ্গের মুখটা ওদের সামনে। অর্জুন বলল, "সাবধানে এগোবেন।"

অর্জুন একটু এগিয়েই টর্চ বের করে আলো ফেলল। স্যাঁতসেতে নোংরা সুড়ঙ্গপথটা বেশি লম্বা নয়। একটা বিশাল হলঘরের মতো জায়গা। সেখানে তাদের দেখামাত্র ঝুলন্ত বাদুড়গুলো তীব্র প্রতিবাদ করতে করতে উড়তে শুরু করল। লাঠির আঘাতে কয়েকটাকে মেরে ফেলতেই বাদুড়গুলো দ্রুত পাথরের খাঁজে খাঁজে চলে গেল। ঠিক তখনই মেজর চিৎকার করে উঠলেন। অর্জুন দেখতে পেল ওদের। তিনজন কালো লোমওয়ালা প্রাণী উল্টোদিকের চাতাল মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। যেটুকু আলো উপর থেকে চুঁইয়ে নিচে পড়ছিল, তাতেই বোঝা গেল ওরা তাদের দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রাণীগুলো লম্বায় প্রায় মানুষের মতো কিন্তু লোমভর্তি মাথা বেশ ছোট। চোখ গোল। গরিলার সঙ্গে খানিকটা মিল থাকলেও ওরা কখনওই গরিলা নয়। কিন্তু ওরা কোনও শব্দ করছে না। তিনজনেই হাতে তুলে নিয়েছে বড় বড় পাথর। অর্জুনের সন্দেহ হল না, সে এদের একজনকে দেখেছে নিশ্চয় ঝরনার পাশে, এরাই একজন মালবাহককে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

আক্রান্ত হবে জেনেই চর্টের আলো ওদের মুখের উপর ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফেলে দু'হাতে মুখ ঢাকল ওরা। মেজর চিৎকার করলেন, "এ্যাই হতচ্ছাড়া, চিচিঙ্গে, বদমায়েশ গরিলার ভাগ্নে। মারতে চাস আমাদের? এতবড় আস্পর্ধা?" গলা ফাটিয়ে বলা শব্দগুলো ইকো হতেই অর্জুনের কানের পর্দায় অসুবিধা হল। সেই আওয়াজে যেন ভয় পেল লোমশ প্রাণীগুলো। অর্জুনের মনে পড়ল, নিচেও দেখা গিয়েছিল ওরা আগুন আর জোর আওয়াজকে ভয় পায়। পিঠের রুকস্যাক থেকে একটা ছোট মশাল বের করল সে। মেজরের সংগ্রহ করা অতি আধুনিক মশাল। শিলিগুড়িতে মাত্র দুটো পাওয়া গিয়েছিল। একবার ধরালে অন্তত আধঘণ্টা জ্বলে। অর্জুন মশাল জ্বালতেই ভরদুপুর হয়ে গেল জায়গাটা। ততক্ষণে প্রাণীগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেছে। অর্জুন বলল, "যতটা পারেন চিৎকার করুন। আমার পিছন পিছন আসুন।"

দু'জনে চিৎকার করতে করতে প্রাণীগুলোর পালাবার পথ ধরে মশালের আলো সামনে রেখে এগোতেই দেখতে পেল দৃশ্যটা। অন্তত পনেরো ষোলোটা পুরুষ এবং নারী লোমশ প্রাণী ঘিরে রেখেছে একটা পেল্লাই সাইজের কাঠের সিন্দুক। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও ওরা সেখান থেকে সরছে না। উল্টে দাঁত খিঁচিয়ে তাদের ভয় দেখাচ্ছে।

চাপা গলায় মেজর বললেন, "ওই তো, ওই তো! ওর ভিতরেই আছে সেই সম্পদ যার কথা লিখে গেছে স্টিফেন। আঃ, একটা পিস্তল থাকলে ব্যাটাদের সরিয়ে দেওয়া যেত। এখন কী করবে? মারপিট করে পারবে?"

মেজর গলা নামিয়ে কথা বলতেই ওই দল থেকে কয়েকজন সন্তর্পণে এগোতে শুরু করেছিল। তাই দেখে মেজর আবার চিৎকার করলেন, "আরে! এই উল্লুক, এই মর্কট, তোদের সাহস দেখছি খুব বেড়ে গেছে...।" সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীগুলো দ্রুত ফিরে গেল বাক্সটার কাছে।

আর তখনই দুম দুম আওয়াজ কানে এল। কাছাকাছি কোথাও সেই আওয়াজটা শুরু হয়ে বেড়ে চলেছে। অর্জুন দেখল প্রাণীগুলোও সেই আওয়াজে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেছে। তারপর প্রায় ঝড়ের মতো ওরা ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল বাক্স ছেড়ে। তখনই পায়ের তলার পাথর কেঁপে উঠল।

মেজর দ্রুত বাক্সটার কাছে পৌঁছে দুই হাতে ওর ঢাকনা খুলতে চেষ্টা করলেন। অর্জুন বুঝতে পারল শব্দটা খুব কাছে এসে

গেছে। সে এগিয়ে গিয়ে মেজরকে টানল, "বাঁচতে হলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। চলুন।"

"কিন্তু যার জন্যে এলাম—।" মেজর আপত্তি জানালেন।

"ওটা খোলার পর আর বেঁচে থাকবেন না। আসুন।" অর্জুন ছুটল যেদিক দিয়ে প্রাণীগুলো পালিয়েছিল। মেজর একটু ইতস্তত করলেও শেষপর্যন্ত ওই দুমদুম আওয়াজে ভয় পেয়ে অর্জুনকে অনুসরণ করলেন।

সেই প্রাণীগুলোকে দেখতে পেল না অর্জুন কিন্তু পাহাড়ের উপরের এই পথটা নিচ থেকে দেখা যায় না বলেই তাদের সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। মেজর হাঁফাতে হাঁফাতে উপরে উঠতেই নিচে ভয়ঙ্কর শব্দ হল। আচমকা একটা জলের ঝটকা নিচ থেকে ছিটকে উঠল উপরে। অর্জুন চেঁচাল, "চলুন, এখান থেকে শিগগির নিচে চলুন।"

এত কম সময়ে ওরা স্বাভাবিক অবস্থায় নিচে নামতে পারত না। একটা বড় পাথরের উপরে উঠে ওরা দেখল পাহাড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপর যে সুড়ঙ্গ দিয়ে ওরা প্রথমে ঢুকেছিল সে সুড়ঙ্গ পথে প্রবল স্রোতে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। স্রোতের চাপে সুড়ঙ্গটা বড় হয়ে গেছে। পাহাড়ের এই অংশ কাঁপছে। যে পাথরের উপর অর্জুনরা আশ্রয় নিয়েছিল তার দু'পাশ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। তারপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাহাড়ের এদিকটা। মেজর চিৎকার করলেন, "লাভা, লাভা বের হচ্ছে অর্জুন।"

"অসম্ভব। এখানে আগ্নেয়গিরি আছে বলে শুনিনি।"

"পৃথিবীর পেটভর্তি লাভা আছে, যে কোনও জায়গা দিয়ে তা বেরিয়ে আসতে পারে। ওই দেখো, জলের স্রোত থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এ সব থেমে গেলে ফিরে গিয়ে বাক্সটাকে খুলব সেই চান্স আর পেলাম না।"

"আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওই লাভার স্রোতে আমরাও ছাই হয়ে যাব। কিন্তু আমি ভাবছি ওরা কোথায় গেল!" অর্জুন চারপাশে তাকাল।

"ওই উজবুকগুলো?"

"উজবুক কি না জানি না। তবে ওরাই ওই বাক্স যুগ যুগ ধরে পাহারা দিত। ওদেরই প্রেতাত্মা বলে কল্পনা করা হত। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ওরা কথা বলে না। হয়তো বলতে পারে না। কোথায় গেল ওরা?"

"আচ্ছা, এতদিন তো বেশ ছিল, আজই দুমদাম শব্দ করে পাহাড় ভেঙে জল বেরুবার কী দরকার ছিল? প্রকৃতিও শত্রুতা করল?" মেজর তাকালেন। "ভুলটা আমারই।" অর্জুন বলল, "ওই লোমশ প্রাণীগুলো চিৎকার শুনলে ভয় পায় বলে আমরা চেঁচিয়েছিলাম। চিৎকারের মাত্রা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তার প্রতিধ্বনিতে নিশ্চয়ই চিড় ধরেছিল পাহাড়ের ভিতর জমে থাকা আদিম জলাধারে। একবার চিড় ধরলেই জল তার রাস্তা তৈরি করে ফেলে। দুমদুম আওয়াজটা হচ্ছিল জল এবং পাহাড়ের সঙ্ঘাতের জন্য।"

ধীরে ধীরে জলের স্রোত কমে এল। বহু বছর ধরে একমাত্র বৃষ্টির জল পেয়েছে ওই পাথুরে জমি। আজ তার উপর দিয়ে দুরন্ত স্রোত বয়ে নিচের খাদের দিকে চলে গেল। অর্জুন দেখল মেজর আফসোসে মাথা নাড়ছেন। বাক্সটা নিশ্চয়ই পাহাড়চাপা হয়ে রয়েছে। যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ওই পাহাড় সরানো সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে অত পাহাড়ের চাপে বাক্স গুঁড়িয়ে গিয়েছে। হয়তো সেই গুঁড়োগুলো জলের তোড়ে ভেসে গেছে। এখন ওই দিকটা মৃত্যুগহ্বর হয়ে রয়েছে। যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

ওরা যখন কোনওরকমে তিনপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এল তখন শুনতে পেল, উল্লাসের আওয়াজ। একটু এগোতেই দেখতে পেল কুলদীপকে। ছুটে এসে দু'জনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে কুলদীপ বলল, "ওঃ, খুব ভয় পেয়েছিলাম। যা আওয়াজ আর তারপর যেভাবে জল ছুটে এল তাতে মনে হচ্ছিল—"

"আমরা আর বেঁচে নেই।" মেজর বাক্যটি শেষ করলেন। তারপর একটা বড় শ্বাস ফেলে মেজর বললেন, "সব শেষ হয়ে গেল হে। যে জন্যে এসেছিলাম, তা হাতছাড়া হয়ে গেল। অথচ চোখের সামনে দেখেছিলাম কাঠের বাক্সটাকে। ওই বেল্লিক লোমওয়ালাগুলোর ওখানে পাহারা দেওয়ার কী দরকার ছিল, তাহলে আমি চেঁচাতাম না। না চেঁচালে পাহাড়ে চিড় ধরত না।"

অর্জুন বলল, "আমিও তো চেঁচিয়েছি, না চেঁচালে—।"

"রাখো। একবার আমি ম্যাটান আইল্যান্ডের ধরে দাঁড়িয়ে এমন চেঁচিয়েছিলাম যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নড়ে উঠেছিল। পুলিশ দশ ডলার ফাইন করেছিল আমাকে।" মেজর বললেন।

"আপনি কখন এলেন?" কুলদীপকে জিজ্ঞাসা করল অর্জুন।

"দুপুরবেলায়। ছেলেটা একটু সুস্থ হতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এসেছি।" কুলদীপ বলল, "চলুন বিশ্রাম করবেন।"

আজ চারটে তাঁবু টাঙানো হয়েছে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে মেজর শুয়ে পড়লেন। অর্জুন কুলদীপকে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলছিল। এই সময় মালবাহকদের প্রধান এসে দাঁড়াল, "স্যর।"

কুলদীপ মাথা নাড়ল, "ক্যা?"

"ইয়ে চিজ পানি হঠ যানে কা বাদ আভি মিলা।"

লোকটা একটা সোনালি টুকরো কুলদীপের হাতে দিল। মেজর উঠে বসলেন, "দেখি।" কুলদীপ তাঁর হাতে ওটা তুলে দিলে তিনি চোখের সামনে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। "সলিড সোনার টুকরো। গায়ে অবোধ্য ভাষায় কিছু লেখা ছিল। নিশ্চয়ই বাক্স ভেঙে জলের স্রোতে ভেসে এসেছে। এটা একটা টুকরো, অন্তত তিরিশ চল্লিশ গ্রাম সলিড সোনা। কী করবে?"

অর্জুন বলল, "বাক্স খুলতে না পেরে আফসোস করছিলেন, আপনি নিন।"

"না অর্জুন। পুরোটা থাকলে নেওয়ার কথা ভাবতাম, টুকরো চাই না। তুমি এটাকে রাখো।" মেজর অর্জুনকে ওটা দিলে সে কুলদীপকে বলল, "আমার কথায় আপনি এসেছিলেন। আপনি ভুটানি না জানলে আমরা আসতে পারতাম না। তাই আপনি রাখুন।"

কুলদীপ মাথা নাড়ল, "আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে যারা এটা কুড়িয়ে পেয়েছে তাদের দিলে কেমন হয়?"

অর্জুন আর মেজর খুশি হয়ে মাথা নাড়লে স্বর্ণখণ্ডটি প্রধানকে দেওয়া হল।

দু'সপ্তাহ পরে নিউ ইয়র্ক থেকে মেজরের উত্তেজিত গলা টেলিফোনে ভেসে এল, "ওহে মধ্যম পাণ্ডব, বাক্সটা খুলতে পারিনি বলে আর আফসোস নেই। আমার ক্যামেরায় যে সব ছবি উঠেছে তার প্রিন্ট লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে পারি। ওই লোমশ বেল্লিকগুলোর ছবি দেখে খুব মায়া হচ্ছে হে! বেচারারা কথা বলতে পারে না। আমার এক বন্ধু বললেন, ওরা পৃথিবীর শেষ বনমানুষ। তারপরেই মানুষ জন্ম নিয়েছিল। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

কাহিনী পরিচয়

শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন ১৪১৯- এ প্রথম প্রকাশিত